INTERNATIONAL RELATION AND ORGANISATION

BA

Fifth Semester

[Bengali Edition]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Sanat Kumar Das

Associate Professor, Gobordanga Hindu College

Authors

Palash Biswas, Assistant Professor, Barasat College, Department of Political Science

Biswajit Gain, Assistant Professor, Gobordanga College

Gobinda Naskar, Assistant Professor, Dum Dum Motijhil College

Copyright © Reserved, 2018

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বইম্যাপিং
প্রথম একক :	**একক -১**
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	পৃষ্ঠা (1 - 28)
দ্বিতীয় একক :	**একক - ২**
বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিদেশ নীতি সমূহ	পৃষ্ঠা (29 - 70)
তৃতীয় একক :	**একক - ৩**
নয়া উপনিবেশবাদ	পৃষ্ঠা (71 - 100)
চতুর্থ একক :	**একক - ৪**
আন্তর্জাতিক সংগঠন	পৃষ্ঠা (101 - 140)

সূচীপত্র

প্রথম একক : **পৃষ্ঠা (1 - 28)**

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

দ্বিতীয় একক : **পৃষ্ঠা (29 - 70)**

বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিদেশ নীতি সমূহ

তৃতীয় একক : **পৃষ্ঠা (71 - 100)**

নয়া উপনিবেশবাদ

চতুর্থ একক : **পৃষ্ঠা (101 - 140)**

আন্তর্জাতিক সংগঠন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মুখবন্ধ / ভূমিকা

টিপ্পনী

..... কেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর এই পাঠ্যপুস্তক বই লিখতে বসলাম তার একটা কৈফিয়ৎ পাঠক, পাঠিকদের দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। সাম্প্রতিক কালে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় স্নাতক এবং স্নাতোকোত্তর বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র জ্ঞনের শাখা হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিশেষ গুরত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি পরিধির বিরোধ গ্রহণযোগ্য রয়েছে কারণ এই চলমান, ঘটমান বর্তমান, দেশ, কাল ভাবনা সহ বিশ্বব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচনে যুগোপযোগী ও সময় উপযোগী এক বিশেষ কথা। ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষকমন্ডলীর কাছে বিষয়টি এই কারণই পাঠ্যযোগ্য যে পরিবার, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র পেরিয়ে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র কর্মকুশলী, ক্রিয়কলাপ, দেনাপাওনার সম ও অসম বন্টন, চাওয়া, পাওয়া যোগসূত্র - সর্বপরি রাষ্ট্রগুলির আ্যন্তরীন সম্পর্কের যেমন - ইতিহাস, ঐতিহ্য , সংস্কৃতি ইত্যাদি নানান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সহায়তার লাভ করে। যাইওহোক জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আবির্ভাব সমকালীন বিশ্বে একটি অতি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূলত ইঙ্গ-মার্কিন পটভূমিতে এর উদ্ভব, তবে বিগত কয়েক দশকে বিষয়টির প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস চর্চা আজ আর পশ্চিমি সমাজে সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা সে উন্নত হোক, উন্নয়নশীল হোক আর অনুন্নতই হোক, প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিষয়টি আজ সমানভাবে চর্চিত। এই কারণে, কতকগুলি মুখ্য বিষয় আজ এতটাই বহুমুখীন ও জটিল যে কোনো একটি একক রাষ্ট্রের পক্ষে তার সমাধান করা সম্ভবপর নয়, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির যৌথ প্রচেষ্টাই একমাত্র ফলপ্রসূ।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যায়, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন 'জেরেনি বেন্থাস'। তার বিখ্যাত গ্রন্থ "Principles of Morals and Legislation" এ। যাইহোক আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯১৯ সালে 'ডেভিড ডেভিসের' আর্থানুকূলে 'Aberystwytha' এ ওয়েলনস বিশ্ববিদ্যালয় উইড্রো উইলসন এর নামে অধ্যাপনার পদ

টিপ্পনী

সৃষ্টির মাধ্যমে। যদিও ই. এইচ. কার সর্বপ্রথম এই পদটি অলংকৃত করেন। শুরুর পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও তার কূটনৈতিক ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এসেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পূর্বে উল্লেখিত বিষয় ছাড়াও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এখন সাধারণ মানুষের ওপর বিশ্বরাজনীতির প্রভাব, বিশ্বমানবসভ্যতার বিকাশ ইত্যাদি সুনিশ্চিত করতে গিয়ে, কৌশল থেকে নিরাপত্তা, ইতিহাসের চেয়ে তত্ত্ব, অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎকেই সাম্প্রতিক অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। আসলে বিশ্বপরিস্থিতির পরিবর্তনের অনিবার্য ফল হল এশিয়া- আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা সহ সমগ্র ইউরোপ এর আন্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্রম বিবর্তন একবিংশ শতকের সূচনাকালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাঠ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। বিশেষ করে ঠান্ডাযুদ্ধোত্তর পর্বে আন্তর্জাতিক এক আঞ্চলিক রাজনৈতিক সমীকরণ একমের প্রবণ বিশ্বের প্রকোপে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে মার্কিক যুক্তরাষ্ট্র এবং সমভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলি নিজেদের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তনকে অগ্রবর্তি সমাজের সভ্যতা, সংস্কৃতিতে গ্রন্থিত করতে যে বিশ্ববাদের সূচনা ঘটিয়েছে তার সিংহভাগ সভ্যতার সংকটকে ত্বরান্বিত করে। ভুলে গেলে চলবে না ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন এককভাবে এই বিশ্ববাদ ধারার পত্তন করেছিল। সেই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিহীন দুনিয়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমী দুনিয়া ক্ষমতার ভরকেন্দ্র থেকে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বিকেন্দ্রিক ফোকাসে বিশ্ব পরিস্থিতিকে বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রে / বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে তৎপর হলে এক দশকের কিছু পরে সেই চিন্তায় ব্যাপক আঘাত হানে ৯/১১। বদলে যায় আমেরিকা সহ পশ্চিমী দুনিয়ার ভাবমূর্তি, বদল ঘটে প্রত্রিক্রিয়াশীল বিশ্বব্যবস্থার ধারণা। বদলাতে থাকে বিশ্ব পরিস্থিতির ভরকেন্দ্র। ফলে নব্য আবির্ভূত বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাঠককুলকে একদিকে যেমন মোহিত করে তুলেছে তেমনি অন্যদিকে আধিপত্য বা গোষ্ঠীর মত বিষয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পেতে আরম্ভ করেছে যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

যাই হোক বিষয়টি এতটাই বিস্তৃতি যা স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন কর খুবই দুরহ ব্যাপার। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিসট্যান্স এডুকেশনের পাঠ্যসূচিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সংগঠন এই পাঠ্যপুস্তকটি মূলত চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যেখানে, আন্তর্জাতিক

সম্পর্কের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি পরিধি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রাষ্ট্রের বিদেশনীতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঔপনিবেশবাদ ও নয়া ঔপনিবেশবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংগঠন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । সমগ্র বিষয়টি সঠিকভবে ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য হলে আমরা কৃতার্থ্য হব।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রথম একক : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ভূমিকা :

টিপ্পনী

জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আবির্ভাব একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। মূলত ইঙ্গ-মার্কিন পটভূমিতে এর উদ্ভব, তবে বিগত কয়েক দশকে শাস্ত্রটির ব্যাপক প্রকৃতিগত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। শাস্ত্রটির চর্চা আজ আর পশ্চিমী সমাজে সীমাবদ্ধ নেই, সমগ্র বিশ্বের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এ বিষয়ে গবেষণা এবং অধ্যাপনা হচ্ছে। পশ্চিমী দেশের পাশাপশি ভারত সহ বেশকিছু উন্নয়নশিল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষ নিরীক্ষণ ও পর্যলোচনা এবং গভীর অন্বেষণ ও অধ্যায়নের স্পর্শে বর্তমানে বিষয়টিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সহযোগী শাখা হিসাবে চিহ্নিত না করে পৃথক স্বয়ংপূর্ণ বিভাগের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রটি অনেকাংশেই সাম্প্রতিক বিষয়ধর্মী হলেও এর স্বতন্ত্র আছে। শাস্ত্রটি প্রকৃত পক্ষে বিংশ শতক এবং বর্তমান শতকের আন্তর্জাতিক রাজনীতির আচরণমালা এবং প্রক্রিয়াসমূহের পর্যালোচনা করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিধি :

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনার পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কাকে বলে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টি আজকের দিনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞা নির্দেশ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন সুনিদিষ্ট সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। আবার কারও মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুধু রাষ্ট্রীয় স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিভিন্ন বেসরকারী ও আধাসরকারী পর্যায়ের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করবে। অনেকে আবার ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে আলোচনা করার পক্ষপাতী।

টিপ্পনী

সংজ্ঞা :

কে. জে. হলস্টি র মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। আবার পামার ও পারকিনাম এর মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্বসম্পর্কের সকল মানুষ ও গোষ্ঠীর সকল সম্পর্ক মানুষের জীবন, ক্রিয়াকলাপ ও চিন্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, চাপ এবং প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। জি. এ. লিঙ্কননের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন ব্যাক্তি ব্যাবসায়িক সংস্থা, সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত।

অধ্যাপক মর্গেনথাউ (H.J. Morgenthou) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কথাটির চাইতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী । কারণ তাঁর মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি হল মূলত ক্ষমতার লড়াই। নিজ রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও অক্ষুন্ন রাখা এবং অপরাপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাস করার অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলে অভিহিত করেছেন।

ট্রিগভি ম্যাথিয়েসেন এর মতানুযায়ি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার মধ্যে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রমকারী সকল সম্পর্ক অর্থনৈতিক আইনগত রাজনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্ক তা ব্যাক্তিগত বা সরকারি যাই হোক না কেন অন্তর্ভুক্ত।

জন হাইল্টন (John Houlton) এর মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গে বিভিন্ন মানব, গোষ্ঠীর ভাবধারা ও মতাকর্ম জারিত থাকে। তিনি বলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল আন্তর্জাতিক সম্মেলন কূটনীতিবিদদের আদান প্রদান, চুক্তি সম্পাদন, সেনাবাহিনীনিয়োগ, আন্তর্জাতিক অবাধ প্রসার সহ বৈচিত্র্য বিষয় সমূহের আলোচনা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সজ্ঞা নির্নয় প্রসঙ্গে নিকোলাস স্পাইকম্যান বলেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন অন্তর্গত ব্যাক্তিবর্গের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির সমন্বয় সাধন করে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিতে পারি এইভাবে : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে এমন একটি মন্ত্রকে বোঝায় যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, কূটনেটিক, আইনগত, সংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল প্রকার সরকারি ও

বেসরকারি সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা কর। পরিশেষে এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা শুধু তাত্ত্বিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিভিন্ন বিষয়ে প্রায়োগিক দিকগুলো ও এর বিবেচ্য বিষয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি :

টিপ্পনী

নিম্নলিখিত আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

(১) সমাজ বিজ্ঞানের একটি নবীন শাখা : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংপূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে উদ্ভব হয়েছে খুব বেশি দিন হয়নি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শাখা হিসাবে গণ্য করা হত। ক্রমশ বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত কূটনীতি বিদের কার্যাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখনও জনগণ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ দেখাতো না।

(২) সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তির অভাব : কোন একটি বিষয়কে স্বতন্ত্র পাঠ্য বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি পেতে হলে এর একটি নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কোনও কোনও লেখকের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট ধারণা কাঠামো বা তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তোলা হয়নি। উদাহরণসরূপ - পামার ও পারকিনস বলেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আণুকুল্য পেয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টির উদ্ভব ঘটলেও একে এখনও পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র এবং সুসংবদ্ধ বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ এর না আছে কোন সুস্পষ্ট ধারণা কাঠামো না আছে কোনও তাত্ত্বিক ভিত্তি।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতই আলোচনার ধ্রুপদী ঐতিহ্যকে বর্জন করলেন, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের সুনির্দিষ্ট তাত্তবিক কাঠামো গড়ে তোলার কাজে মননিবেশ করলেন। রিচার্ড স্নাইডার পররাষ্ট্রনীতি ও সিদ্ধান্ত নির্ধারণ বিষয়ে তত্ত্বগত আলোচনার অবতারনা করেন। কেনেথ টমসন আলোচনা করেন রাজনীতির বিষয়গুলি নিয়ে। তাছাড়া তিনি আর্ন্তজাতিক আচার আচরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তত্ত্ব গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জন হার্জ আনবিক যুগে আন্তর্জাতিক

রাজনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । কার্ল ডয়েশ্চ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সামাজিক যোগাযোগের একটি বিশেষ দিক হিসাবে বিশ্লেষণ করেন। টমাস সেলিং সামরিক রণকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেন।

টিপ্পনী

(৩) পরম লক্ষ্যবাদ মূলক একটি শাখা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বেশ কিছু আলোচনাতে ব্যাক্তিগত আশা আকাঙ্খার বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে E.H. Carr বলেছেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে পরম লক্ষ্যবাদমূলক ছিল। তাঁর মতে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থ তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আশা আকাঙ্খা কেন্দ্রীক আলোচনার সীমাবদ্ধতাকে প্রকট করে তোলে। মানব সম্পদকে সুন্দর ও শান্তিময় করতে হলে যুদ্ধকে নির্বাসন দিতে হবে । তবে এই ধরনের চিন্তার মধ্যে মহত্ব থাকলেও বাস্তবতার মাত্রা কম থাকে। এই কল্পনাপ্রবণ চিন্তাধারার প্রকাশ পেরেছে অতীতের বহু চিন্তাবিদদের মধ্যে। রাষ্ট্রপতি উইলসন ও এই ধরণের কল্পনা বিলাস থেকে মুক্ত ছিলেন না। তার লীগ অব নেশনস সম্পর্কিত পরিকল্পনাটি ছিল মূলত কল্পনা নির্ভর। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই তার কল্পনার ফানুসটি চুপসে যায়।

(৪) বাস্তববাদের আবির্ভাব : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার তথা বাস্তব রাষ্ট্র ধারার উদ্ভব ঘটে। এই ধারার প্রবক্তাদের মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ফলপ্রসু করতে হলে কল্পনার পরিবর্তে বাস্তবমুখী দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এই ধরণের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে এগিয়ে এলেন মরগেনথাউ, টমসন, স্পাইকম্যান, মাটিনরাইট প্রমুখ। মরগেনথাউয়ের মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষমতার লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়। ("International Politics like all Politics is straggle for Power)। তিনি বলেছেন রাজনীতি বাস্তবাদিতার মূল কথা হল এই যে সামগ্রিকভাবে সমাজের মতো রাজনীতি পরিচালিত হয় কতগুলি আদর্শনিষ্ঠ আইনের দ্বারা আর এইসব আইনের উৎস নিহিত আছে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে।

(৫) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধির সম্প্রসারণ : বর্তমানের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি আগের তুলনায় অনেক বেশি সম্প্রসারিত হয়েছে, প্রথমদিকে

রাষ্ট্রের নীতি ও কাজকর্মের উপর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দৃষ্টিপাত করত। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্র ছাড়া ও বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের (Non-State Actors) গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত অরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন বহুজগতিক সংস্থা বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থা, ক্যাথলিক চার্চ, ন্যাটো, সিয়নেটো, আফ্রিকার ঐক্য সংস্থা ইত্যাদির মত আন্তঃসরকারি সংগঠন CIA, ISI ইত্যাদির মত গুপ্তচরবৃত্তির কাজে নিযুক্ত সংস্থা, বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন প্রভৃতি। এরছাড়া চার্চিলা, রুশভেল্ট, স্টালিন, নেহেরু, প্রমুখ প্রভাবশালী. ব্যাক্তিদেরও আন্তর্জাতিক রাজনীতির কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য করা হয়। আগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় কেবল রাজনৈতিক বিষয় স্থান পেত, কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক বিষয় ছাড়াও অর্থনৈতিক সামাজিক সংস্কৃতিক বিষয়কেও স্থান পেতে দেখা যায়।

(৬) মূল্যোধ নিরপেক্ষনয় : পরিশেষে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতাকেন্দ্রীক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ ও সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনা করে, তেমনি অন্যদিকে সহযোগিতা, মিত্রতা ও সমন্বয় সাধনের বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করে। সহযোগিতা ও শুভবুদ্ধির প্রেক্ষাপটে সে সব কল্যানমুখী শান্তিকামী বিশ্বসংস্থা পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে, তাদের নীতিও কাজকর্মের মূল্যায়ন করাও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বলাবাহুল্য আন্তজর্ণাতিক সম্পর্ক এইধরণের কাজগুলি করে থাকে নির্দিষ্ট মূল্যবোধের ভিত্তিতে। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূল্যবোধ নিরপেক্ষ শাস্ত্র নয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধিও বিষয়বস্তু :

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা খুবই কঠিন কারণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গতিশীল এবং এর বিষয়বস্তু দ্রুত পরিবর্তন শীল। নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব, বহুসংখ্যক আন্তর্জাতিক সংগঠনের আবির্ভাব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতি, আণবিক মারণস্ত্রের প্রসার, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন, সামজতান্ত্রিক শিবিরের উত্থান ও পতন, তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব, বিশ্বজোড়া সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছে উনবিংশ শতাব্দিতে তা কল্পনা করা যেত না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত

টিপ্পনী

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত কূটনীতিবিদদের কার্যাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন জনগণ বিদেশ নীতি অথবা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ দেখাতো না।

কার (E.H. Carr) এর মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রথমাবস্থায় পরম লক্ষ্যবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে যাঁরা মাথা গামাতেন তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পৃথিবী থেকে যুদ্ধজকে চিরতরে নির্বাসন দেওয়া এবং শান্তিপূর্ণ নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা। তাই এত সময় যুদ্ধ প্রতিরোধের উপায় নির্ধারনই ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

টিপ্পনী

যুদ্ধহীন পৃথিবী সে সম্ভব নয় তা কল্পনাবাদী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চিন্তাবিদরা বুঝতে পারেননি। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ তা প্রমাণ করে দিয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ফলপ্রসূ করানো হলে প্রয়োজন বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানো। এই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানোর জন্য এগিয়ে এলেন মরগেন থাউ, টমসন, স্পাইকম্যান, মার্টিন রাইট প্রমুখেরা। মরগেন থাউ এর মতে আন্তর্জাতিক রজনীতি ক্ষমতার লড়াই ছাড়া আর কিছুই নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইকে তিনি আন্তর্জাতিক রজনীতি বা রাজনীতির মুখ্য আলোচ্য বিষয় বলে চিহ্নিত করেছেন। ক্ষমতা, জাতীব স্বার্থ, শক্তিসাম্য, আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ও বিশ্বজনমত, আন্তর্জাতিক আইন, সার্বভৌমিকতা, আধুনিক যুদ্ধ, নিরস্ত্রীকরণ, যৌথ নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সংগঠন, কূটনীতির ভবিষ্যৎ প্রভৃতি বিষয়কে মরগেন থাউ আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।

১৯১৭ সালে গ্রসন কার্ক (Grayson Kirk) পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক কাউন্সিলের রিপোর্টে ৫ বিষয়কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেন, যথা - (১) রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি ও পরিচালনা, (২) রাষ্ট্রীয় শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার কারী উপাদান সমূহ (৩) বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির অবস্থান ও পররাষ্ট্রনীতি (৪) সম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস এবং (৫) একটি অধিকতর স্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থা।

১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদের প্যারিস সম্মেলনে তিনটি

বিষয়কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যধা (আন্তর্জাতিক রাজনীতি । (২) আন্তজাতিক সংগঠন ও প্রশাসন এবং (৩) আন্তর্জাতিক আইন।

১৯৫৮ সালে প্রণীত "The Introduictory Course International Relation" নামক গ্রন্থে ভিনকেন্ট বেকার (Vincent Baker) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় হিসাবে ৭টি বিষয়ের উল্লেখ করেন। যথা - (১) আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রধানন শক্তিসমূহ (২) আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন (৩) জাতীব শক্তির উপাদান সমূহ (৪) জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার (৫) জাতীয় শক্তির সীমাবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণ (৬) বৃহৎ শক্তিধর ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্র নীতি (৭) সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির ইতিআস।

কুইনসি রাইট (Quincy Wdright) তাঁর "The Study of International Relation" নামক গ্রন্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য সূচিকে ৮টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেন । যথা - (১) আন্তর্জাতিক আইন (২) কূটনৈতিক ইতিহাস (৩) সামরিক বিজ্ঞান ও যুদ্ধের কলাকৌশল (৪) আন্তর্জাতিক রাজনীতি (৫) আন্তর্জাতিক সংগঠন (৬) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (৭) ঔপনিবেশিক সরকার (৮) বৈদেশিক নীতি পরিচালনাও নিয়ন্ত্রণ।

পামার ও পারকিনস (palmer and Perkins) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় হিসাবে যেসব বিষয়েদর উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল - (১) রাষ্ট্রব্যবস্থা (২) জাতীব শক্তি (৩) জাতীয় স্বার্থসাধনের হাতিয়ার হিসাবে কূটনীতি (৪) প্রচারকার্য (৫) জাতীয় নীতি প্রয়োগের অর্থনৈতিক হাতিয়ারসমূহ (৬) যুদ্ধ (৭) সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ (৮) শক্তিসম্য (৯) যৌথ নিরাপত্তা (১০) আন্তর্জাতিক আইন (১১) আন্তর্জাতিক সংগঠন (১২) জাতীয় স্বার্থ (১৩) আনবিক মারনাস্ত্র (১৪) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের পররাষ্ট্র নীতি (১৫) পরিবর্তনশিল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আচরণবাদের তাত্ত্বিকগণ যেমন ডেভিড ইস্টন, কার্ল ডায়শ্চ, মর্টন ক্যাপলান, রিচার্ড স্নাইডার প্রমুখ আচরণবাদীদের মতে আন্তর্জাতিক পত্রে বিভিন্ন ব্যাক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী সে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সেগুলিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিবেচ্য হওয়া উচিত । আবার কাঠামোবাদী (Structurlism) তাত্ত্বিকগণের মূল কথা হল এই সে, আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রবেছে গুটি কয়েক প্রভাবশালী পুঁজিবাদী দেশ এবং তার চারপাশে রয়েছে বিশ্বের অধিকাংশ অনুন্নত পরনির্ভরশিল দেশ। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় এই কেন্দ্র প্রান্ত বিশিষ্ট সমগ্র কাঠামোটিও অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন । এই তত্ত্বের প্রবক্তারা হলেন ওয়ালারস্তেইন (I. Wallerstein), স্কোলপল (T. Skolpol) প্রমুখেরা।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় আন্তর্জাতিক সম্পকর্কের আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি চিরদিনের জন্য জন্য বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। এটি একটি পরিবর্তনশীল ও গতিশীল বিষয়। আর এই পরিবর্তনশীলতার আথে সামঞ্জস্য রেখে এর বিষয়সূচির ও পরিবর্তন ঘটে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কর্মকর্তা :

দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় বিশ্বযুদ্ধের কর্মকর্তা (Actors) নামক ধারণাটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে । আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কর্মকর্তা বলতে এমন একটি আপেক্ষিকভাবে স্বাধিকার সম্পন্ন সংস্থা বা এককে বোঝায় যা অন্যান্য স্বাধিকারসম্পন্ন সস্থার আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। এখানে আপেক্ষিকভাবে কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে এই কারণে যে সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোন দলই পুরোপুরি স্বাধীনভবে কাজ করতে পারে না । প্রত্যেক কর্মকর্তাকেই অর্থনৈতিক, সামরিক,ও কৃৎ-কৌশলগত দিক থেকে অন্যের উপর কিছু পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। এর নির্ভর করতে হয়। এর নির্ভরশীলতা যার যত কম আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার স্বাধিকার তত বেশি । সহজভাবে বললে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কর্মকর্তা বলতে তাদের কেই বোঝায় যারা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি কর্মকর্তা হিসাবে রাষ্ট্রর ভূমিকা :

ঐতিহ্যবাহি দৃষ্টিভঙ্গিতে সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রকেই শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কর্মকর্তা হিসাবে ভাবা হত। দীর্ঘদিন যাবৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল

বিষয় ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া প্রভৃতি সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু হিসাবে সার্বভৌম রাষ্ট্র ছাড়া অন্য বহু ধরণের কর্মকর্তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন, আঞ্চলিক সংস্থা সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট, বহুজাতিক কর্পোরেশন ইত্যাদি অরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ সামপ্রতিক কালের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। এই সমস্ত অরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের আলোচনা বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা করা যায় না। তবে রাষ্ট্রই হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির মুখ্য কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক জীবন ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত প্রাধান্যকারী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

টিপ্পনী

আন্তর্জাতিক আইনে জাতীয় রাষ্ট্রগুলিই কেবল মাত্র কর্মকর্তার মর্যাদা ভোগ করে। আন্তর্জাতিক আইনের চোখে প্রতিটি জাতীয় রাষ্ট্র পূর্ণ আইনগত ব্যাক্তিত্বের অধিকারী। আন্তর্জাতিক আদালতে কেবলমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলিই বিচার প্রার্থী হবার অধিকারী ভোগ করে। আন্তর্জাতিক আদালতেরে কাছে কোন ব্যাক্তি বা সংস্থা নয়। কেবলমাত্র রাষ্ট্রগুলিরই আইনগত স্বীকৃতি রয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে সকল রাষ্ট্র সমান হলেও জাতীয় শক্তি ও ভূমিকা পালনের দিক থেকে রাষ্ট্র গুলির মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রমতে কোন রাষ্ট্র কতকখানি ভূমিকা পালন করবে তা নির্ভর করে তার শক্তি বা ক্ষমতার উপর। অধ্যাপক পামার ও পারকিন্স জাতীয় শক্তির দিক থেকে রাষ্ট্রগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছে - (১) বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র (২) মাঝারি শক্তিধর রাষ্ট্র এবং (৩) অনিশ্চিত মর্যাদা সমপন্ন রাষ্ট্র। বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রাধান্যকারী ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে অনেক সময় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি রাষ্ট্রের নীতি ও কার্যাবলি, রাষ্ট্রপ্রধানের সফল নেতৃত্ব প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কম শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রকেও বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়, আবার কোন বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে কোন একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেও পরবর্তিকালে অপেক্ষাকৃত নিস্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে।

অধ্যাপক ফ্রাঙ্কেলের মতে কতগুলি কারণে আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে প্রাধান্য কারী অবস্থানে বিরাজ করে। যেমন -

টিপ্পনী

(ক) সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় দিক থেকেই তাদের বৈধতা বজায় রেখেছে।

(খ) জাতীয় রাষ্ট্রগুলিই হল সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন এবং তারা অধিকাংশ নাগরিকের সর্বোচ্চ আনুগত্য লাভ করে।

(গ) জাতীয় রাষ্ট্রগুলি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের অধিারী এবং কেবলমাত্র তাদের অধীনেই বৈধ সামরিকবাহিনী রয়েছে।

(ঘ) বহুমুখী উদ্দেশ্যবোধক সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্র বিচিত্রমুখী কার্য সম্পাদন করে।

(ঙ) জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত কোন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়নি।

অধ্যাপক ফ্রাঙ্কেলের মতে বর্তমানে যে জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা রয়েছে তাকে অবলুপ্ত করার যে কোন প্রচেষ্টাই বিশ্বশান্তির পক্ষে ক্ষতিকারক। এই ধরণের প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নষ্ট করবে এবং বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনবে। তাই বিশ্বশান্তি রক্ষার স্বার্থেই বর্তমান জাতীয় ভূখন্ডকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।

ভূখন্ড কেন্দ্রিক জাতিয় সার্বভৌম রাষট্রের সংকট :

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেক বিশেষজ্ঞের মতে বর্তমানে জাতীব রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভাঙনের পালা শুরু হয়ে গেছে বহু অতিজাতীয় শক্তি আত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে রাষ্ট্রের সার্বভৌমকতাকে সঙ্কুচিত করেছে। জন হার্জ এর মতে প্রযুক্তিগত বিপ্লব ভূখন্ডকেন্দ্রিক জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অর্থহীন করে তুলেছে। মরগেন ধাউ বলেন যে, প্রযুক্তবিদ্যার বভাপকক অগ্রগতি এবং সাম্প্রতিককালের বিশ্বপরিস্থিতি সাবেকি জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণাকে অর্থহীন করে তুলেছে। হনস্টি বেলছেন, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভূখন্ডগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে বর্তমানে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র বাইরের হস্তক্ষেপের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলি বহিঃশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রভাব ও ক্ষমতা হ্রাসের এই পরিস্থিতিকেই ভূখন্ডকেন্দ্রিক সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের সংকট রূপে অবিহিত করা হয়ে থাকে। ম্যাকনোলান এর মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি কোন মৌলিক ধারণার উদ্ভব ঘটে থাকে,

তা হল জাতীয় রাষ্ট্রবভবস্থার ভাঙনের পালন।

জাতীয় রাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাসের কারণ হিসাবে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন। কৌলাম্বিস এবং উলফ মনে করেন, সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি, অতিজাতীয় সংগঠনের উদ্ভব, অতি জাতীয় মতাদর্সগত ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসার, পারস্পরিক নির্ভরশীলতার রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি জাতীয় রাষ্ট্রেদর গুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছে।

ফ্রাঙ্কেল এর মতে সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র নিজ প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হলেও নতুন পরিস্থিতিকে মোকাবিলার জন্য নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। আন্তর্জাতিক সংগঠন, মোর্চা জোট ইত্যাদি তৈরি করেছে। এর ফলে রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় হয়েছে সত্য। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পদের উপাদান ও সদস্য হিসাবে নিজ সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয়েছে।

জন আর্জের মতে বিশ্বের জাতীয় রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে মূলত তিন ধরনের ল্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, যথা - সামরিক, অর্থনৈতিক, ও মনস্তাত্ত্বিক। সামরিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অকল্পনীয় উন্নতি সামরিক কলাকৌশলের অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়েছে। আনবিক অস্ত্র, আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে ভীষনভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রেই তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। দরিদ্র দেশগুলি শিল্পজাত দ্রব্য, প্রযুক্তি, বৈদেশিক ঋন প্রভৃতির ব্যাপারে ধনী দেশগুলির উপর নির্ভরশিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই পারস্পারিক নির্ভরশিলতা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন করেছে। এছাড়া বর্তমানে রেড়িও, টেলিভিশন ইন্টানেট এবং অন্য সব প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে কোন রাষ্ট্র তার শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে পারে এবং একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। হাজেদর মতে এই ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে আজকের দিনে প্রতিটি রাষ্ট্রই কমবেশি অসহায় বোধ করছে। তাই বলেছেন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী আঞ্চলিক জোটের দ্বারা পরিচালিত হবে।

কোন কোন লেখকের মতে বর্তমান দিনের রাষ্ট্র নেতারা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি অপেক্ষা আর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। সমাজতন্ত্রের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রমুখ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক ঘাটি বানানো অপেক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও বিশ্ববাজার দখলের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে চাইছে। স্বাভাবিক ভাবে রাষ্ট্র অপেক্ষা বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার ভূমিকা বাড়ছে। কারও কারও মতে বিশ্বব্যঙ্ক বিশ্ববানিজ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থভাবের নির্দেশ ও কর্মসূচি জাতীয় রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমিকতাকে সংকুচিত করেছে। এছাড়া বর্তমান দিনের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সমস্যা হল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তৎপরতা বৃদ্ধি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গুলির কার্যকলাপ জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

পরিশেষে একথা বলা যায় বর্তমান দিনে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার চরিত্র আমূল পরিবর্তিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই যে এখনও কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বস্তুতপক্ষে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আজও রাষ্ট্রই মুখ্য কর্মকর্তাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ। রাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মৌলিক একক হিসাবে থেকে গেছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের ভূমিকা :

বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রছাড়া বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাকে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের কাজকর্ম ও ভূমিকা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। যোশেফ ফ্রাঙ্কেল (Joshep Frankel) এই সব অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের দুভাগে ভাগ করেছেন যথা - (১) আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকারি সংস্থা এবং (২) আন্তঃরাষ্ট্রীয় বেসরকারি কর্মকর্তা। নিচে এইসব অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাজকর্ম ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(১) আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকারি সংস্থা সমূহ :

সাম্প্রতিক কালের বিশ্ব রাজনীতিতে আন্তরাষ্ট্রীয় সরকারি সংস্থাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকারি সংস্থা বলতে সেইসব সংস্থাকে বোঝায় যেগুলি গঠিত হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রকে নিয়ে। এইসব সংস্থা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে এবং বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত

করার ক্ষমতা রাখে। বর্তমানে দুই ধরণের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকারি সংস্থা রয়েছে - (ক) বিশ্বজনীন এবং (খ) আঞ্চলিক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও তার অধিনস্থ সংস্থাগুলি প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আবার NATO, CENTO, SEATO, OPEC, COMECON, SAARC ইত্যাদি সংস্থাগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ :

টিপ্পনী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার উপর জাতিপুঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব নাট্য করা যায় । উপনিবেশের অবসান, পরিবেশদূষণ রোধ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ, মানবাধিকার সংরক্ষণ, বিশ্বসম্পদ সংরক্ষণ, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। সকল সদস্য রাষ্টকেই জাতিপুঞ্জের নির্দেশ এবং সংসদে উল্লেখিত নিয়মাবলি মেনে চলতে হয়। এছাড়া জাতিপুঞ্জের IMF, IBRD, UNESCO, EAO, ILO বহু উদ্দেশ্যসাধক সংস্থা রয়েছে । এইগুলি বিশ্বের বিশেষ করে অণুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক সংস্কৃতিক এবং অন্যান্য বহু সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তবে ভিটো ক্ষমতার জোরে জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ি সদস্য সেভাবে বিশ্বরাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে তা সম্ভব হয় না।

আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ :

বিশ্বজনীন সংস্থার মতো আঞ্চলিক স্তরে গঠিত আন্তঃসরকারি সংস্থাগুলিও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পারস্পারিক আলোচনা মত বিনিময় ও সহযোগিতার মাধ্যমে আঞ্চলিক তথা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এই সব আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে ওঠে। আন্তরাষ্ট্রীয় আঞ্চলিক সংস্থার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিরক্ষামূলক সংস্থা (যেমন NATO, SEATO, CENTO প্রভৃতি সামরিক জোট) অর্থনৈতিক সংস্থার মধ্যে রয়েছে (EEC, COMECON, OPEC, A D B ইত্যাদি) এবং বহু উদ্দেশ্যসাধক সংস্থা (যেমন অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস, অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি, আরব লিগ, শর্ক, ইসলামিক কনফারেন্স, ইস্ট আফ্রিকান বা কমিউনিটি ইত্যাদি) এই সমস্ত সংস্থাগুলি নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার

মাধ্যমে সমাধানের রাস্তা খোঁজে।

(২) আন্তঃরাষ্ট্রীয় বেসরকারি কর্মকর্তা :

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় এমন কিছু বেসরকারি সংস্থা রয়েছে যেগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ রোমান ক্যাথলিক চার্চ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শ্রমিক সংঘ, বহুজাগতিক সংস্থা ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি কোন একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের ভূখন্ডের মধ্যে সীমিত না থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রসারিত হয় এবং ঐসব রাযষ্ট্রের রাজনীতি ও অর্থনৈতিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারে। যোশেফ ফ্রাঙ্কেল এই সব সংস্থাকে অতিজাতীয় কর্মকর্তা নামে আখ্যায়িত করেছেন। হনস্টি এইসব অতিজাতীয় কর্মকর্তাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন : (১) এইসব সংস্থা একই সঙ্গে একাধিক দেশে সংগঠিতভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করে। (২) এদের কার্যাবলী কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের আভ্যন্তরীন স্বার্থের সঙ্গে জড়িত থাকে না এবং (৩) এরা মূলত অরাজনৈতিক প্রকৃতির হয়।

ক্যাথলিক চার্চ :

ক্যাথলিক চার্চের সদর দপ্তর রোমে অবস্থিত হলেও বিভিন্ন দেশে এর শাখা প্রশাখা রয়েছে বিশ্বের প্রায় ৫০ টি দেশের সঙ্গে চার্চের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে একটি অরাজনৈতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর ক্যাথলিক চার্চের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কখনও কখনও কোন দেশের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতেও চার্চকেও হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায়। গফত শতকের ৮০ এর দশকে পোল্যান্ডে সলিডারিটির সঙ্গে সরকারের বিরোধে পোপ মধ্যস্থতার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। এইভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধ, বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে চার্চ তার মতামত ব্যাক্ত করেছে এবং বিশ্বের ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী মানুষদের প্রভাবিত করেছে।

শ্রমিক সংঘ :

বিশ্বে এমন কতগুলি শ্রমিক সংস্থা রয়েছে যেগুওলি জাতীয় গন্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক রূপধারণ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিকদের দুটি বিশাল

টিপ্পনী

আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে প্রভাবিত World Federation of Frade Union (W.F.T.U) এবং অপরটি পুঁজিবাদী আদর্শে প্রভাবিত International Confederotion of Free Union (I.C.F.T.U)। এই সব শ্রমিক সংস্থার প্রধান লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক ভাবে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করা। তবে কখও কখনও এরা রাজনৈতিক ব্যাপারেও জড়িত থাকে।

টিপ্পনী

বহুজাতিক সংস্থা :

অরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হল বহুজাগতিক ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি । আন্তজাতিক কাজ নীতিতে এদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জন স্পেনিয়ার এর মতে বহুজাগতিক সংস্থা বলতে সেইসব সংস্থাকে বোঝায় যারা বিভিন্ন দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন বাজারে প্রবেশ করে। জি. এম. গিলপিনের মতে বহুজাগতিক সংস্থা হল সেইসব সংস্থা যাদের অর্থনৈতিক উদ্যেগসমূহ দুই বা ততোধিক দেশে ক্রিয়াশীল থাকে । সহজভবে বললে বহুজাগতিক সংস্থা হল সেইসব অর্থনৈতিক সংগঠন যারা একই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে, বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাজকর্ম আপাতদৃষ্টিতে অরাজনৈতিক হলেও এরা তাদের বিপুল অর্থনৈতিক শক্তির সাহায্যে বিভিন্ন দেশের রাজনীতির উপরও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকারের উত্থান-পতনের পশ্চাতে এদের সক্রিয় ভূমিকা থাকতে দেখা যায়।

অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় বেসরকারী কর্মকর্তা :

বিশ্বে আরও কিছু অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা রয়েছে যাদেরকে আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। যেমন - জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন রাজনৈতিক দল উপজাতীয় গোষ্ঠী, চাপসৃষ্টি কারী গোষ্ঠী ইত্যাদি এই শ্রেনীর অন্তভুক্ত । আবার আরবলিগ, ইহুদিদের লবি, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন, দক্ষিন ভিয়েতনাম ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট প্রভৃতি এমন অনেক সংগঠন রয়েছে যাদের কার্যাবলি মূলত দেশের মধ্যে সীমিত থাকে তৎসত্ত্বেও এগুলি অনেক সময় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এছাড়া বিশ্বে বেশ কিছু গোপন কাজকর্ম পরিচালনকারী সংস্থা রয়েছে যেমন সিয়া (Centrol Itelligence Agency - CIA), আই, এস, আই (Inter

টিপ্পনী

Ser vice Interlligence - ISI) ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো বা সরকারের পতন ঘটানোর ক্ষেত্রে বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মদত দেওবার ব্যাপারে এইসব সংস্থা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এই ভাবে বিশ্বরাজনীতিকে প্রভাবিত করে।

এছাড়া আন্তজাতিক রাজনীতিতে ব্যাক্তির ভূমিকা ও কম নয়। অনেক বভাক্তি তাদের অসামানভ ক্ষমতা ও দক্ষতার বলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বর্পূ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের নেহেরু, যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের নাসের, কিউবার ফিদেলকাস্ত্রো, সোভিয়েত রাশিয়ার লেনিন, স্তালিন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিশেষে একথা বলা যায় সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য বহু অরাষ্ট্রীয় সংস্থা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এই সব রাষ্ট্রীয় সংস্থার আলোচনা বাদ দিয়ে বিশ্বরাজনীতির সঠিক চরিত্র বিশ্লেষণ করা কখনই সম্ভব নয়। কাগজে কলমে এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমানা অক্ষত থাকলেও পরস্পর নির্ভরশীলতাও বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা সেই সীমানার বিষয়টিকে তাৎপর্যহীন করে তুলেছে।

জাতীয় শক্তি :

রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে এই ক্ষমতার তারণাতি বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বাট্রান্ড কাসেল চার্লস মেরিয়াস, হ্যারল্ড লাসওবেল, আব্রাহাম ক্যাপনান, মরগেনথাউ প্রমুখের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্ষমতার ধারণাটি আধুনিক কালের আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনায় একটি মুখ্য ধারণারূপে পরিগণিত হয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই চায় শান্তি ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে এবং দেশের সম্মান তথা গৌরবকে প্রসারিত করতে। ক্ষমতা ছাড়া সম্ভব নয়। অধভাপক মরগেনথাউ এর মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চুড়ান্ত লক্ষ্য যাই ওক না কেন, ক্ষমতাই হল এর প্রাথমিক লক্ষ্য। অরগানিক (A.K. Organski) এর মতে কোন জাতীয় রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কী ভূমিকা পালন করে তা অনেকাংশে তার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। একথা ঠিক সে কোন রাজনীতিই ক্ষমতা অর্জন ও

প্রকাশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতার উপস্থিতি ও ভূমিকা খুব বেশি মাত্রায় অনুভূত হয়। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে অনেক সময় ক্ষমতার রাজনীতি (Power Politics) বলে উল্লেখ করা হয়।

ভারতীয় শক্তির সংজ্ঞা :

টিপ্পনী

ক্ষমতার কোনো সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভবে ক্ষমতার সংজ্ঞা দিবয়েছেন। সাধারণভাবে ক্ষমতা বলতে বোঝায় অন্য কোনো ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণ ও কার্যকলাপকে নিজের ইচ্ছানুযায়ি প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য। অরগানস্কির মতে ক্ষমতা বলতে নিজের লক্ষ্য অনুযায়ী অপরের আচার আচরণকে প্রভাবিত করার সামর্থ্যে বোঝায়। ক্ষমতা রাজনীতির প্রবক্তা অধ্যাপক মরগেনথাউ বলেছেন, কোনো ব্যাক্তির মন ও ক্রিয়াকলাপের উপর অন্য ব্যাক্তির নিয়ন্ত্রণ হল ক্ষমতা (When we speak of power we mean mans control over the minds action of other men")। এই নিয়ন্ত্রন বল প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা মনস্তাত্তবিক বন্ধনের মাধ্যমে আসতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণ সংবিধানিক উপায়ে আমরা দুধার পশু শক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। জোসেফ ফ্রাঙ্কেল এর মতে শক্তি হল প্রত্যাশিত ফল লাভ করার সামর্থ্য। পামার ও পারকিনস এর মতে শক্তি বলতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো রাষ্ট্রের সামগ্রিক কার্যাকারি তাকে বোঝায়।

জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ :

জাতীয় শক্তির নির্ধারক উপাদান গুলি কী - এই প্রশ্নর উত্তরে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।উদাহরণস্বরূপ E.H. carr জাতীয় শক্তির উপাদান গুলিতে তিনভাগে ভাগ করেছেন, যথা -(১) সামরিক উপাদান (২) অর্থনৈতিক উপাদান এবং (৩) জনমতের উপর প্রভাব আবার অধ্যাপক পামার ও পারকিনস জাতীয় শক্তির সাত প্রকার উপাদানের উল্লেখ করেছেন - (১) ভোগলিক উপাদান (২) কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদ (৩) জনসংখ্যা (৪) প্রযুক্তিবিদ্যা (৫) মতাদর্শ (৬) জাতীয় আত্মবিশ্বাস এবং (৭) জাতীয় নেতৃত্ব।

অরগানস্কি জাতীয় শক্তির নির্ধারক উপাদানগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন - (১) প্রাকৃতিক উপাদান এবং (২) সামাজিক উপাদান। মরগেনথাউ আবার জাতীয় শক্তির উপাদানগুলিকে স্থায়ী উপাদান সমূহ এবং পরিবর্তনশীল উপাদান

সমূহ - এই দুইভাগে ভাগ করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে জাতীয় শক্তির প্রধান প্রধান উপাদান গুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করা হল -

(১) ভূগোল (Geography) :

টিপ্পনী

জাতিয় শক্তির উপাদান হিসাবে ভূগোলের ভূমিকা প্লেটো, অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই স্বীকৃত। আধুনিক কালেও অনেক লেখকগণ ভূগোলকে একটি দেশের জাতীয় শক্তির প্রধান নির্ধারক উপাদান বলে গণ্য করেছেন। মরগেনথাউ বলেছেন "যে সকল স্থায়ী উপমানের উপর একটি দেশের শক্তি নির্ভর করে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল ভূগোল।" ভূগোল বলতে সাধারণভবে কোনো দেশের আয়তন, জলবায়ু, অবস্থান, ভূপ্রকৃতিগত বিন্যাস ইত্যাদিকে বোঝানো হয়ে থাকে।

(ক) আয়তন :

ভৌগলিক উপাদানের মধ্যে কোন দেশের ভূখন্ডের আয়তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন দশের আয়তন নানাভাবে জাতীয় শক্তি নির্ধারণে সাহায্য করে। বর্তমান পৃথিবীতে দুই অতি শক্তিধর রাষ্ট্র - রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই বিশাল ভূখন্ডের অধিকারী। তবে ভূখন্ডের আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বভবআরযোগ্য জমি সম্পদ প্রভৃতি বিবেচনা ককরতে হবে। অব্যবহারযোগ্য সম্পদহীন ভূভাগের গুরুত্ব খুবই কম।

তবে আয়তন বড় হলেই সে জাতীয় শক্তি বেশি হবে সে কথা সবসময় নিশ্চিত করে বলা যায় না। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স তার স্বল্প আয়তন নিয়েই সারা পৃথিবীতে বিশাল সাম্রাজ্যকে গড়ে তুলেছিল। আবার জাপান তার স্বল্প আয়তন নিয়ে অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

(খ) জলবায়ু :

জলবায়ু ভৌগলিক উপাদানের অংশ সেই হিসেবে তা জাতীয় শক্তিকে প্রভাবিত করে। অনেক ক্ষেত্রে কোন দেশের অবস্থানের উপর তার জলবায়ু নির্ভর করে। অবস্থান অনুযায়ী কোন দেশ উষ্ণ বা শীতপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর অন্তর্গত হতে পারে জলবায়ু কোন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, ও জণগণের কর্মক্ষমতা নির্ধারন করে। অতিরিক্ত উষ্ণ ও শুদ্ধ জলবায়ু কৃষির পক্ষে ক্ষতিকারক

।মোসুমি বায়ুর অন্তর্গত অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের উপর কৃষি উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জনগণের কর্মদক্ষতা বেশি থাকে। একথা সত্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বলে মানুষ অনেক স্থানে প্রতিকূল অবস্থার প্রভাবকে দমন করেছে। তবে তা সত্ত্বেই জলবায়ু জাতীয় শক্তি নির্ধারণে আজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

টিপ্পনী

(গ) ভূপ্রকৃতি :

ভৌগলিক উপাদানের মধ্যে ভূপ্রকৃতি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভূপ্রকৃতির উপর মৃত্তিকার অবস্থা জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রভৃতি নির্ভর করে। সে দেশের অভ্যন্তরে পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদি বেশি থাকে সে দেশের যোগাযোগ ও যাতাযাতের ক্ষেত্রে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়। যোগাযোগ ও যাতাযাতের ক্ষেত্রে বহু অসুবিধা অর্থনৈতিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। আবার অন্যদিকে কোন দেশের মধ্যে পর্যাপ্ত নদী, নালা থাকলে সেই দেশ জনসম্পদের সুবিধা ভোগ করে।

(ঘ) অবস্থান :

কোন দেশের ভৌগলিক অবস্থান তার ক্ষমতা ও ভূমিকাকে নির্ধারণ করে। অবস্থান কোন দেশের রণকৌশল ও কূটনৈতিকেও প্রভাবিত করে। কোন দেশের ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির হয় যে সেই দেশে একটি নৌশক্তি বা জলশক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানের ভৌগলিক অবস্থানই তাদের নৌশক্তিতে পরিণত করেছে। মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের অবস্থানই তাদের নৌশক্তিতে পরিণত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের জন্য ঐ দেশ নৌশক্তি বৃদ্ধি করেছে। অপরদিকে জার্মানি জলবেষ্টিত বলে স্থলশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ভৌগলিক অবস্থান কোন দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া ও ইউরোপ থেকে জলপথে বিচ্ছিন্ন তাই স্থলপথে তাকে আক্রমণ করা সম্ভব নয়। আবার জার্মানি, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া - স্থলনভাগ দ্বারা বেষ্টিত বলে এইসব দেশ স্থলপধে বার বার আক্রান্ত হয়ছে। ভোগলিক অবস্থাব অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। সমুদ্রের উপকূলবর্তি দেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভোগ করে। সমুদ্রের কাছাকাছি দেশগুলি সাম্রাজ্যে বিস্তারের সুবিধা ভোগ করে। কোন দেশের ভৌগলিক অবস্থান আন্তর্জাতিক রজনীতিতেও তার স্থান ও ভূমিকা

নির্ধারণ করে।

(২) জনসংখ্যা :

জাতীয় শক্তির অণ্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জনসংখ্যা বা মানবসম্পদ। তবে জনসংখ্যাকে দেশের প্রয়োজন ও সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। জনসংখভা কম হলে দেশের সম্পদের যথাযথ বভবহার হয় না ল আবার খুব বেশি হলে দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অশিক্ষা, বেকারত্ব প্রভৃতি অভিশাপগুলি দেশকে দুর্বল করে দেবে। যেমন ভারতবর্ষের দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ এর অধিক জনসংখ্যা। দেশের উন্নতির প্রাথমিক শর্ত হল দক্ষ, শিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনগণ। দক্ষ ও শিক্ষিত জনসাধারণ যেমন দেশের সম্পদ স্বরূপ ঠিক তেমনি অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও নৈপুন্যহীন জনসাধারণ শক্তি বেশি হবে এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। তা হলে ভারত ও চীন জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে প্রধান দুটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হত। জাপান, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলি লোকসংখ্যায় বৃহৎ না হয়েও পৃথিবীর মধ্যে অনভতম শক্তিশালী দেশ হতে সক্ষম হয়েছে। তবে সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট লোকবল প্রয়োজন। একটি দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশ যদি তরুণ হয় তবে তা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। কারণ তরুণদের উৎপাদনশীলনতা বেশি। আবার জাতিয় শক্তি বিচার করার সময় জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির কথাও মনে রাকা প্রয়োজন।

(৩) প্রাকৃতিক সম্পদ :

জাতীয় শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, জল সম্পদ, বন্য প্রাণী, মৃত্তিকার উর্বরতা প্রভৃতিকে বোঝায়।

জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে কৃষিজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। যে দেশ খকাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং অন্য দেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে সে দেশকে বাঁচতে হয়। সেই দেশ ককনই বৃহৎ শক্তিতে পরিগণিত হতে পারে। সে দেশে তীব্র খাদ্য সমস্যা বর্তমান সেই দেশ দুর্বল হতে বাধ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। খাদ্য ছাড়া অন্যান্য এই সব কৃষিজ দ্রব্য শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

টিপ্পনী

জাতীয় শক্তির নির্ধারক হিসাবে খাদ্যের মত অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব কম নয়। আধুনিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে দেশ - ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। সেই দেশের পক্ষে আণবিক অস্ত্র তৈরি করার পক্ষে সহজতর হয়। সে সব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালের সাহায্যে আধুনিক প্রতিরক্ষামূলক দ্রব্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। সেই সব দেশই অন্যান্য দেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

টিপ্পনী

প্রাকৃতিক সম্পদ জদেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্যে করে। শিল্পোন্নয়ন ছাড়া কোনো দেশের পক্ষে শক্তিশালী হওয়া ম্ভব নয়। বিশ্বের শিল্পোন্নয়ন দেশগুলিই আন্র্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। সে সব দেশ কয়লা, খনিজ তেল,জলবিদ্যুৎ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ, সেইসব দেশের শিল্পন্নয়নের হার তুলনামূলক ভাবে বেশি। এছাড়া লৌহ, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, রূপো, সোনা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি শিল্পেদর কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেসব দেশে এই সব কাঁচামাল নেই তাদের পক্ষে শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। তবে কোনো দেসে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকলোএই সে শিল্পন্নয়ন হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যাতিরেখে কোনো দেশের পক্ষএ তার প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

(8) অর্থনৈতিক উন্নয়ন :

জাতীব শক্তির অণ্যতম প্রধান উপাদান হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কোনো দেশের সময় শিল্পের বিকাশ, প্রতিরক্ষার আধুনিককরণ শিল্পায়ন প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতি ইত্যাদি সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের উপর নির্ভরশীল। সাধারণ ভাবে মোট জাতীয় উৎপাদন মাথাপিছু আয় শিল্পের হার জীবন মাত্রার মান, শ্রমিকদের উৎপাদন শীলতা প্রভৃতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়।

কোনো দেশের অর্থণৈতিক উন্নয়নের হার তার প্রযুক্তিগত দক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কোন দেশ প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত হলে তার শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। আবার সে দেশের কাঁচামালের পরিমাণ যতবেশি, অর্থনৈতিক ক্ষমতাও তার তত

বেশি হবে। শিল্পোন্নয়ন একটা দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে সুদৃঢ় করতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাতিরেখে কোন দেশ শক্তিশালী হতে পারে না। অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলিই বিশ্বরাজনীতিক নিয়ন্ত্রণ করে এবং অনুন্নত দেশগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

টিপ্পনী

(৫) সামরিক ক্ষমতা :

জাতীয় শক্তির অণ্যতম প্রধান উপাদান হল সামরিক ক্ষমতা। বৈদেশিক নীতিকে কার্যকর করতে গেলে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োজন। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তার করতে হলেও সামরিক ও প্রতিরক্ষা দিক থেকে শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। সামরিক শক্তিতে দুর্বল একটি দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমীহ আদায় করতে সক্ষম হয় না। তবে সামরিক ক্ষমতা শুধু সৈণ্যবাহিনীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সৈণ্যদের নৈপুন্য, সেনাপতির সঠিক নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, সমরাস্ত্রের উৎকর্ষ, সামরিক রণকৌশল এবং কী ধরণের সামরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন সেইসম্বন্ধে সম্যক ধারণা ইত্যাদির উপর। বর্তমান দিনে একটি দেশের সামরিক শক্তি কেবল তার গতানুগতিক স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর উপর নির্ভরশীল নেই। আধুনিক আণবিক বোমা, আন্তঃদেশীয় ক্ষপনাস্ত্র এবং অনভান্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মারণাস্ত্রের উপর তার সামরিক শক্তির মাত্রা নির্ভরশিল।আবার আধুনিক মারণাস্ত্র ও রণকৌশল মার্কাই যধেষ্ট নয়, সমরিক ক্ষমতায় ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রশ্নটি ও গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনে প্রতিটি বৃহৎ শক্তিধর দেশেরই অন্যতম লক্ষ্য হল নিজেকে সমরিক দিক থেকে শক্তিশালি করা এবং অণ্যকাউকে তার আক্রামণাত্মক নীতিও কার্যাবলী থেকে বিরত রাখা।

(৬) রাজনেতিক কাঠামো :

একটি দেশের রাজনৈতিক কাঠমো তথা সরকারের প্রকৃতির উপর সেই দেশের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভরশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার জনসমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় জাতির আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংকটে সেই সরকার সহজেই জনগণের সহযোগিতা পেতে পারে। ব্যাপক জনসমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার জাতির আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংকটে জনগণের স্যোগিতা পায় এবং বৈদেশিক আক্রমণের সময় জনসাধারণকে সহজে সংঘবদ্ধ করতে পারে।একটি

দেশের সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হল জাতীয় স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করা এবং তা কার্যকর করে তোলা এই দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ হলে কোন দেশেদর পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। মরগেন থাউ এর মতে জাতীয় শক্তি বাড়াতে গেলে একটি দেশের সরকারকে তিনটি কাজ করতে হবে। (ক) দেশের সম্পদ ও পররাষ্ট্রনিতীর মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। (খ) জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা ককরতে হবে এবং (গ) গৃহীত নীতির সমর্থনে জনসমর্থন অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। একটি সুদক্ষ সরকার তার বিদেশনীতির সপক্ষে শুধু নিজ দেশের জণগণের সমর্থন আদয় করেই ক্ষান্ত থাকবে না, অন্যান্য দেশের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে থাকে। কোনো সরকারের গৃহীত নীতির পক্ষে অন্যদেশের সমর্থন জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সরকারি নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারিদের ভূমিকাও কম নয়। জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার যে নিতিই গ্রহণ করুক না কেন, সরকারি কর্মচারীদের সাহায্যে ও সহযোগিতা ব্যাতীত তা কার্যকর করা সম্ভব নয়। আমলারা যদি সৎ ও দক্ষ হয় তা হলে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে সরকারের বিদেশনীতি রূপায়নে দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের যথেষ্ট ভূমিকা থাকে। দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা অযোগ্য ও অদক্ষ হলে জাতীয় শক্তির সমস্ত উপাদান থাকা সত্ত্বেও সেই দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভব বিস্তার করতে ব্যার্থ হয়। তাই মরগেনথাউ কূটনৈতিকে জাতীয় শক্তির মস্তিস্ক (Brain of National Power) বলে গণ্য করেছেন।

(৭) নেতৃত্ব :

জাতীয় শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকাও কম নয়। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগলিক অবস্থান, মানবিক শক্তি, অর্থনৈতিক বিকাশ, সামরিকি দক্ষতা ইত্যাদি উপাদানকে কতটা, কখন এবং কীভাবে প্রয়োগ করলে জাতীর উন্নতি ঘটবে তা স্থির করেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ যদি দক্ষ ও বিচক্ষণ হন তাহলে দেশের সুনাম ও শক্তি বাড়ে। আর যদি অদক্ষ ও অবিবেচক হন তাহলে জাতীয় শক্তি দুর্বল হয়। বর্তমানে চীনের উন্নতির মূলে রয়েছে ঐ দেশের বর্তমান নেতৃবৃন্দের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দক্ষতা, যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা । সাম্প্রতিক অতীতে যেসব নেতা বা নেত্রী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ও অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - লেনিন, স্তালিন, চার্চিল, মাও জে দঙ, নেহেরু, ইন্দিরাগান্ধী, মুজিবর রহমান প্রমুখ। তবে শুধু মাত্র দক্ষ নেতা থাকলেই দেশের শক্তি বাড়ে এমন নয়, শক্তি বৃদ্ধির অন্যান্য সহায়ক উপাদান ও থাকতে হবে। দেশের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক উপাদানগুলি যেমন সামরিক শক্তি উন্নত অর্থনীতি, শিক্ষিত এবং সচেতন নাগরিক অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে দক্ষ নেতার সকল উদ্যোগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

(৮) কূটনিতি :

জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে কূটণীতির ভূমিকাও কম নয় ।মরগেনথাউ কূটনীতিকে জাতীয় ক্ষমতার অণ্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে গণ্য করেছেন। শক্তির উপাদানসমূকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করে কূটনীতি কোন দেশের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে । তিনি বলেছেন কোন দেশের সামরিক প্রস্তুতি, কাঁচামাল, ভৌগলিক অবস্থান শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি সবকিছু অর্থহীন হয়ে যেতে পারে যদি না সেই দেশটি কূটনৈতিক দিক থেকে সাফল্য পায়। তাই তিনি বলেন "কূটনীতি হল জাতীয় ক্ষমতার মস্তিস্ক স্বরূপ আর জাতিয় মনোবল হল তার আত্মা।"

(৯) মনস্তাত্ত্বিক উপাদন :

জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানকে উপেক্ষা করা যায় না । মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে পড়ে জাতির নৈতিকশক্তি, আত্মবিশ্বাস, জাতীয় চরিত্র, জাতীয় মর্যাদা ইত্যাদি। কোনো দেশের জনসাধারণের নৈতিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস জনগণকে দেশের জন্য সংগ্রাম করতে এবং দেশের কল্যায়ণ জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে জাপান, জার্মানি প্রভৃতি দেশ গুলি যেভাবে অল্প দিনের মধ্যে পুনরুত্থান করে তা নিঃসন্দেহে নজির বিহীন। আর এই পুনরুত্থানের মূল চাবিকাঠি হল জনগণের আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক দৃঠতা। যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতার অভাব থাকে, সেই দেশ - যুদ্ধ বা জাতীব সংকটে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

(১০) সামাজিক উপাদান :

জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে সামাজিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক উপাদানের মধ্যে পড়ে সমাজে জাতি, ধর্ম, বর্ণগত কাঠামো ইত্যাদি। একটি দেশের জনসাধারণ যদি একই জাতি, ধর্ম ও ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় হয় এবং দেশ শক্তিশালী হয়। ইংল্যান্ডের জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ এবং সেই কারণে দেশটি শক্তিশালী হতে পেরেছে। অপর পক্ষে জণসাধারণের মধ্যে জাতি, বর্ণ ও ভাষাগত ক্ষেত্রে অনৈক ধাকলে তাদের মধভে ঐক্য বজায় রাখা কঠিন হয়। সামাজিক অনৈক দেশকে দুর্বল করে তোলে এবং তার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বিরোধ আবার শ্রীলঙ্কায় তামিল ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে দুর্বল করে দিয়েছে।

টিপ্পনী

(১১) জাতীয় চরিত্র :

জাতীয় চরিত্রের বিষয়টিও জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশের শক্তি তার জাতীয় চরিত্রের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এক এক দেশের এক এক ধরনের জাতীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন ইংল্যান্ড ও আমেরিকাবাসিরা যেখানে ব্যাক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার উপর জোর দেয়। আবার জার্মানি ও রাশিয়ার নাগরিকরা সেখানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় কর্ম প্রচেষ্টার উপর বেশি জোর দেয়। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা জার্মান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, আবার কর্মে একাগ্রতা জাপানীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। একটি দেশ তার বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনার সময় এই জাতিয় বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করতে পারে না। ভারতীয়দের থেকে ইউরোপীয়দের শৃঙ্খলাপরায়নতা কর্মনিষ্ঠা অনেক বেশি। তাই ইউরোপের দেশগুলি ভারতের থেকে অনেক উন্নত। তবে জাতীয় চরিত্রের অবদান পরিমাপযোগ্য নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চরিত্র অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়।

(১২) আন্তর্জাতিক অবস্থান :

জাতিয় শক্তি কেবলমাত্র আভ্যন্তরীন অবস্থার উপর নির্ভর করে না। আন্তর্জাতিক অবস্থানের উপরও অনেকখানি নির্ভরশীল। জাতীয় শক্তি তথা স্বাথের

টিপ্পনী

খাতিরে কোন রাষ্ট্র এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে, আবার জোট নিরপেক্ষ থাকতে পারে। একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্র অন্য একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক জোট গঠন বা চুক্তি সম্পাদন করে নিজের ক্ষমতাকে প্রসারিত করতে পারে। তবে জোত গঠন ও চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিজের স্বার্থে রক্ষা করতে গেলে পরিবর্তে কিছু ক্ষতি স্বীকার ও করতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জারীয় ক্ষমতা বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে। কোন একটি বিশেষ উপাদান খুব বেশি পরিমাণে ধাকলেই কোন দেশ শক্তিশালী হয় না। সামরিক শক্তিতে খুব বেশি বলীয়ান হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত জনসম্পদ নেতৃত্ব ও কূটনৈতিক নৈপুন্য না থাকার ফলে কোন একটি দেশ দুর্বল থেকে যেতে পারে। অনুরূপভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পন্নয়ন, খাদ্যসংস্থান ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটানো তা দেশকে শক্তিশালী না করে দুর্বল করে দেয়। সুতরাং জাতীয় শক্তি বিচারের সময় এই সমস্ত বিষয়কে বিবেচনার মধ্যে রাখা উচিত।

প্রশ্নমালা :

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা দাও, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিধির বিস্তারিত আলোচনা কর।

২. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভুমিকা পালনকারী বলতে কি বোঝ?

৩. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয়ভূমিকা পালনকারি রূপে রাষ্ট্রের ভূমিকার বিস্তারিত আলোচনা কর।

৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যে সরকারী সক্রিয় ভূমিকা পালনকারির আলোচনা কর।

৫. ভূখন্ডকেন্দ্রিক সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকার সংকট বলতে কি বোঝ?

৬. জাতিয় শক্তি বলতে কি বোঝ?

গ্রন্থপঞ্জী :

১. রাধারমন চক্রবর্তী, সুকল্পা চক্রবর্তী - সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রগতিশীল

প্রকাশক, কলকাতা - ২০০৯

২. নির্মলকান্তি ঘোষ, পিতম ঘোষ, - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, শ্রীভূমি পাবলিশিং, কলকাতা - ২০০৪

৩. শক্তি মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংগঠন ও পররাষ্ট্র নীতি, ওয়ার্ল্ড প্রেস, কলকাতা - ২০০০

৪. অনীক চট্টোপাধ্যায় - ঠান্ডা যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০১২

৫. গৌতম কুমার বসু - সমসাময়িক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০১২

৬. প্রাণগোবিন্দ দাশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা) লিমিটেড, কলকাতা - ২০১১

৭. গৌরিপদ ভট্টাচার্য - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০০৪

৮. আরূপ সেন - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব ও তথ্য, নবোদয় পাবলিকেশনস, কলকাতা - ২০১২

৯. ড. অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সেন্ট্রাল পাবলিশিং, কলকাতা - ২০০৪

১০. অঞ্জনা ঘোষ - ঠান্ডাযুদ্ধ উত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংকট ও প্রবণতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ,কলকাতা - ২০০৭

১১. বানীপদ সেন - সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়, বিন্যাস ও ব্যাখ্যা ; বিক্রম প্রকাশক ২০১০

টিপ্পনী

টিপ্পনী

একক - ২ : বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিদেশ নীতি সমূহ

ভূমিকা :

টিপ্পনী

আধুনিক বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই এককভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনা। প্রতিটি রাষ্ট্রই পারস্পরিক নির্ভরশিলতার দ্বারা আবদ্ধ। এই কারনেই প্রতিটি রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষের সঙ্গে সু-সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্যরূপে রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যম নির্ধারিত এবং নিয়নিত হয়। পররাষ্ট্র নিতি বা বিদেশনিতির মাধ্যমেরই কোনো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সমাজের ঘটনা ও সমস্যা সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রীয়া প্রকাশ করে ও নিজের আন্তর্জাতিক আচরণের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে।

আন্তর্জাতিক পটভূমি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ঠান্ডা যুদ্ধ ও দ্বি-মেরু প্রবণতার অবসান, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একমেরু প্রবণতার উদ্ভব নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া ইতিপূর্বে আনবিক মারণাসের প্রসার, অর্থনৈতিক, আজনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তরাষ্ট্রীয় নির্ভরশিলতাকে ব্যপকাতর করেছে। প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজের জাতিয় নীতি, লক্ষ্য এবং স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য নিজের জাতীয় নীতী, লক্ষ্য এবং স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট থাকে। পররাষ্ট্র নীতি বা বিদেশনীতি হল ঐ নীতি, লক্ষ্য এবং স্বার্থ বাস্তবায়নের এটি বিশেষ পদ্ধতিগত মাধ্যম। বস্তুতপক্ষে, পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় আশা আকাঙ্কা ও নীতি প্রকাশিত হয়। পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে প্রতিটি রাষ্ট্র তার আন্তর্জাতিক আচরণ নির্ধারণ এবং সমর্থন সংগ্রহ ও বৈধকরণের চেষ্টা করে।

কিন্তু কোন নিতির ভিত্তিতে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, বিভিন্ন দেশ সে বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে কোন দেশই নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণ করে না। স্বল্পকালিন এবং দীর্ঘকালীন লক্ষ্য ও নানাপ্রকার চিন্তাভাবনার দ্বারা কোন দেশ

টিপ্পনী

অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিদেশনীতির মাধ্যমেই এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হল নিজের প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষা পুরণ, জাতিয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশেদর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা এবং জাতিয় নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। বিদেশনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। বিদেশনীতি নির্ধারনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি বা সংস্থা জাতিয় মুল্যবোধ এবং স্বার্থ বিবেচনার মাধ্যমনে আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্যোগ গ্রহন করেন।

বিদেশনীতি কোন্ কোন উপাদানের দ্বারাপ্রভাবিত বিদেশনীতির লক্ষ্য কী, পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া, বিদেশ নিতি কীভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং কোন্ কোন্ হাতিয়ারের মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগ করা হয় এইসব বিষয় অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশনীতির মাধ্যমে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত হয় এবং এই সম্পর্ক নির্ধারনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করতে হয়।

এককের উদ্দেশ্য :

বর্তমান পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে এবং বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় প্রতিটি দেশই পারস্পারিক নির্ভর শীলতায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিচ্ছিন্ন্যভাবে কোন দেশের পক্ষেই সমস্যার সমাধান বা ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। সেই কারণেই পারস্পারিক নির্ভরশীলতা এবং সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে উঠেছে।এই প্রেক্ষিতেই বিদেশ নীতি প্রত্যেক রাষ্ট্রই কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কোন দেশের সাথে অন্য কোন দেশের সম্পর্ক কেমন হবে, তা নির্ধারিত হয় বিদেশনীতির দ্বারা। তাই এই এককে বিদেশনীতির দুটি মূল উপাদান- কূটনীতি ও প্রচারকর্মের বিশদে আলোচনার পাশাপাশি ভারত, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের বিদেশনিতির সম্যক আলোচনা করা হয়েছে, যা ছাত্রছাত্রীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

বিদেশনীতির সংজ্ঞা :

বিদেশনীতি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এবং ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত। বৃহত্তর অর্থে বলতে গেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণের ধরণ নিয়েই বিদেশনিতি গড়ে ওঠে। বিদেশনীতি হল নির্দিষ্ট আন্তঃরাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ অনুসরনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রক্রিয়া বিশেষ। বিদেশ নীতির মাধ্যমে যেকোন রাষ্ট্র বিষয়ক কোন সিদ্ধান্তকে যুক্তি সহকারে ব্যাক্যা করার এষ্টা করে থাকে। এককথায় বিদেশ নীতি হল বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যুক্তিযুক্ত প্রতিক্রিয়া। আন্তর্জাতিক সমাজে প্রত্যেক রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের রূপরেখাই হল বিদেশনীতির প্রধান উপজীব্য।

বিদেশনীতিকে সংকীর্ণ এবং ব্যপক অর্থে ব্যখ্যা করা যায়। সেলেইচার এর মতে ব্যাপকঅর্থে বিদেশ ণীতি বলতে বাহ্যিক পরিবেশ সম্পর্কে কোন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পরিকল্পনা এবং ক্রিয়া কলাপকে বোঝায় বিস্তৃতভাবে বিদেশনীতির সংজ্ঞা নির্দেশের সময় তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয় , লক্ষ্য, নীতি বিষয়ক পরিকল্পনা এবং বাহ্যিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র কতৃক গৃহীত ব্যবস্থা।

সংকীর্ণ অর্থে বিদেশ নীতি বলতে রাষ্ট্রের এক্রিয়ার সহির্ভূত মানবিক আচরণকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

প্যাডেলফোর্ড ও লিঙ্কন এর মতে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন রাষ্ট্র তার ব্যপক লক্ষ্য এবং স্বার্থকে সুনির্দিষ্ট ক্রিয়ায় পরিণত করে ও তার মাধ্যমে ঐ লক্ষ্য সাধন ও স্বার্থ সংরক্ষনের চেষ্টা করা, বিদেশ নীতি হল ঐ প্রক্রিয়ার মুখ্য উপাদান।

যোশেফ ফ্রাঙ্কেলের মতে, পররাষ্ট্রনীতি বলতে সেই ধরনের সিদ্ধান্ত বা ক্রীয়াকলাপের সমষ্টিকে বোঝায় যা একাধিক রাষ্ট্রের সম্পর্কের সাথে জড়িত।

হলস্টির মতে পররাষ্ট্রনীতির ধারনা কোনক্রমেই স্পষ্ট নয়। এই কারণেই তিনি পররাষ্ট্র নীতিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন - (১) পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি; (২) জাতীয় ভূমিকা ; (৩) লক্ষ্য ; (৪) ক্রিয়া কলাপ ও আচরণ।

পররাষ্ট্র নীতি বলতে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্পর্কে কোন রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া, বর্তমান ও প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তের ক্রিয়া -কলাপের সমষ্টিকে ক্রিয়া কলাপের সমষ্টিকে

টিপ্পনী

বোঝায় । জাতীয় স্বার্থ, লক্ষ্য এবং লক্ষ্যপূরণের মাধ্যম পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিদেশনীতির নির্ধারক সমূহ :

টিপ্পনী

প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য পররাষ্ট্রনীতি প্রনয়ন করে। এই নীতি এককভাবে নীতি প্রনয়নকারীদের ইচ্ছা ও বিবেচনার উপর নির্ভরশীল নয় । বিদেশ নীতির প্রণেতাগণকে বহু বিষয়ে বিবেচনার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। বহু উপাদানের দ্বারা তারা প্রভাবিত হল। যেসব উপাদানের দ্বারা পররাষ্ট্রনীতি বা বিদেশণীতি প্রভাবিত হয় তাদেদর পরাষ্ট্রনীতির নির্ধারণ বলা হয়।

পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক সমূহের মধ্যে ভৌগলিক সামরিক অবস্থান, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, মতাদর্শগত পরিবেশ, সামরিক সামর্থ্য, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার , সরকার, জাতীয় নেতৃত্ব এক কূটনীতির গুণগত মান, প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং আর্ন্তজাতিক সমাজের অনানভ সদস্যদের আচরণ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যে, বিদেশনীতির নির্ধারণের সংখ্যা অনেক। কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে নির্দিষ্ট উপাদান মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এককভাবে কোনো উপাদান বিদেশ নীতির নির্ধারকে পরিণত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একাধিক উপাদান বিদেশনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

ভৌগলিক - সামরিক অবস্থান :

বিদেশনীতির উপর ভৌগলিক প্রভাবের দুটি দিক আছে - রাষ্ট্রের ভৌগলিক পরিবেশ এবং তার ভৌগলিক অবস্থানের আমরিক - রাজনীতিক গুরুত্ব । রাষ্ট্রের ভৌগলিক পরিবেশ বলতে বোঝায় তার আয়তন, ভূভাগ, জলবায়ু প্রভৃতিকে। রাষ্ট্রের আদর্শ ভৌগলিক পরিবেশ হল - (১) রাষ্ট্রের আয়তন এমন হবে যেন, অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় যথোপযুক্ত মান বজায় থাকে (২) জলবায়ু কঠোর শ্রমের অনুকূল হওয়া প্রোজন (৩) ভু-ভাগ জাতিয় প্রতিরক্ষার সহায়ক হওবা দরকার। পাআড়, পর্বত, নদি, সমুদ্র বেষ্টিত দেশ প্রাকৃতিক কারনেই বৈদেশিক আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকার

ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করা ; (৪) রাষ্ট্রের আকৃতি এমন হোয়া প্রয়োজন যেন যুদ্ধাবস্থায় নিজেকেই সহজেই রক্ষা করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশের পক্ষেই আদর্শ ভৌগলিক পরিবেশের আনুকূল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি দেশের ভৌগলিক অবস্থান তার পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত করে । যেমন ভৌগলিক অবস্থান এবং বীশাল আয়তন ও জলবায়ু সোভিয়েত ইউনিয়ননের প্রতিরক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে । ভারতের ভৌগলিক অবস্থান দক্ষিন এশিয়ায় তার গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে । ভারতের ছোট নিরপেক্ষ নীতি তার ভৌগলিক অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

টিপ্পনী

জনসংখ্যা :

জনসংখ্যাকে পররাষ্ট্রনীতির একটি উল্লেখযোগ্য নির্ধারক রূপে গন্য করা হয়। দীর্ঘকাল ধরে জনসংখ্যাকে রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিমাপের মানদন্ড হিসাবে গণ্য করা হয় । অতিতের যুদ্ধে পদাতিক বাহিনীর উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করাহত । পঞ্চাশের দশকে কোরিয়ার যুদ্ধে চীন এক বিশাল পদাতিক বাহিনী মার্কিন বাহিনীর প্রতিরোধ সহায়ক হয়েছিল।

অনেকে মনে করেন পারমানবিক অস্ত্রের প্রসারের ফলে বিদেশ নীতি নির্ধারণে সৈন্য সংখ্যার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সৈন্য সংখ্যার গুরুত্ব হীন হয়ে পড়েনি । বর্তমান যুগেও যুদ্ধের রস সরবরাহের জন্যও বহু ব্যাক্তির প্রয়োজন। জনবহুল রাষ্ট্রে যুদ্ধের অনেক ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেও নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় জন সম্পদের সাহায্যে নিজের সামর্থ্য আংশীক ভাবে অব্যাহত রাখতে পারে । তাছাড়া নাগরিকদের সকল অংশের মধ্যেও সংহতি রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ, রাজনৈতিক, চেতনা, শিক্ষার প্রসার, রাজনৈতিক অংশ গ্রহনের সুযোগ সুবিধা, জনমতের চাপ প্রভৃতির উপর পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারনে জনসংখ্যার গুরুত্ব নির্ভরশিল।

ইতিহাস :

প্রতিটির জাতীয় ইতিহাসের দ্বারাও বিদেশনীতি প্রভাবিত হয় । বিশেষ পরিস্থিতির চাপে ও ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে প্রতিটি জাতির ইতিহাসের রূপরেখা গড়ে ওঠে। উদ্ভব ঘটে তার নির্দিষ্ট পরিচয় এবং স্বতন্ত্রতায়। ঐতিহাসিক ঘটনার মতে

প্রতিঘাত মাধ্যমেই প্রতিটি জাতির ভৌগলিক সীমানা নির্ধারিত; কোনো জাতির বিকাষের ইতিহাসের দ্বারা পররাষ্ট্র নীতির অনেক মৌলিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকেই প্রত্যেক জাতি তার পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি গঠন করে। যেমন ভারত বিভাজন এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব উভয় দেশের মধ্যেও স্বাভাবিক শত্রুতা সৃষ্টি করেছে।

টিপ্পনী

অর্থনৈতিকি সম্পদ :

অর্থনৈতিক সম্পদের দ্বারা বিদেশ নীতির প্রকৃতি ও ধারা নির্ধারিত হয়। কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি তার সামর্থ্যের সূচক। অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐ সামর্থ্যের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী দেশ সহজেই নিজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় খনিজ তেলে সমৃদ্ধ মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আবার প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব কোনো দেশকে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। এরফলে পররাষ্ট্রনিতির উপর তার প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা হ্রাস পায়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়, শিল্পন্নত দেশসমূহ আন্তর্জাতিক রাজনীতিরক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশগুলি শিল্পে উন্নত হওয়ার কারণে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি প্রাধান্য অর্জন করেছে।

মতাদর্শ :

পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম নির্ধারক হল মতাদর্শ। তবে অনেকে মতাদর্শের তুলনায় জাতীয় প্রবোজন পূরনের বিবচনায় প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন।প্রতিটি রাষ্ট্র সংস্থাই নির্দিষ্ট মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়। কোনো রাষ্ট্রেদর মূল্যবোধব, নীতি, কর্মসূচী, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ঐ মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়। মতাদর্শের দ্বারা কোনো রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন নীতিই নির্ধারিত হয় না, বিদেশনীতিও ঐ মতাদর্সের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মার্কসবাদ সকল প্রকার শোষন ও নিপীড়নের বিরোধী।এই কারণেই সমাজ

তান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি হল আগ্রাসন বিরোধী। আবার পুঁজিবাদ শোষন ও নিপীড়নের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে।আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মতাদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক রাষ্ট্রই সহনশিলতা মেনে চলে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃতি :

টিপ্পনী

সরকারের দক্ষতা ও সমর্থন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তার উপর পররাষ্ট্র নীতি নির্ভরশিল। কোন পরিস্থিতিতে কোন ব্যবস্থা কার্যকর হয়, জাতীয় স্বার্থ ও লক্ষ্য পূনরণ করা সম্ভব হবে কিনা তা জাতীয় নেতৃত্বকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সরকারের উদ্যোগ ও নেতৃত্বেই সম্ভাবনা সূচক ক্ষমতা প্রকৃত ক্ষমতায় পরিণত হয় । সরকারের জনপ্রিয়তা, সুসংবদ্ধ প্রাশসনিক কাঠামো, তথ্যসংগ্রহ, এবং সরকারি তৎপরতা, পররাষ্ট্র দপতরের সাথে অন্যান্য দপ্তরের যোগাযোগ প্রভৃতি পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলনা যায়, পররাষ্ট্রনীতিকে কোনো অবস্থাতেই সরকারী নেতৃত্বের প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সরকারী নেতৃত্বের রাজনীতিক অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, ব্যাক্তিত্ব প্রভৃতি বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে। ভারতের লাল বাহাদুর শাস্ত্রীয় সঙ্গে জওহর লাল নেহেরু ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান মন্ত্রীত্ব কালীন পররাষ্ট্র নীতির গতিশীল চরিত্রের পার্থক্য ছিল।

কূটনীতির গুণগত মান :

কূটনীতির গুণগত মানের উপর পররাষ্ট্রনীতির নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক সমাজে কোনো রাষ্ট্রের সাফল্য বা বয়র্থতা তার কূটনৈতিক কৌশল এবং উৎকর্ষের উপর নির্ভরশিল। রাষ্ট্রের প্রতিটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যপূরণ সরকারের কূটনৈতিক চাতুর্য্যের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। কূটনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যাক্তিদের মাধ্যমেই পররাষ্ট্রনীতির সকল লক্ষ্য নির্ধারিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোনো দেশের কূটনীতিবিদগণ বিদেশি রাষ্ট্রের শাসক মন্ডলী ও জনসাধারণকে নিজেদর বক্তব্য ও সমস্যা অনুধাবনে যত সফল হবেন সেই দেশের পররাষ্ট্র নীতিও তত বেশী সফল হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে

টিপ্পনী

বিদেশনীতি বহু উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত। স্থান ও কাল ভেদে কোনো বিশেষ উপাদান অন্যান্য উপাদানের তুলনায় গুরুত্ব অর্জন করতে পারে। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোনো উপাদান অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। স্থান ও সময়ের পরিবর্তনের ফলে সেই উপাদানই প্রধান নির্ধারকের ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং কোনো বিশেষ নির্ধারণের ভূমিকা সম্পর্কে কোনো সার্বজনীন তত্ত্ব সাধন সম্ভব নয়।

বিদেশনীতি রূপায়নে জাতীয় স্বার্থের ভূমিকা :

জাতীয় স্বার্থর ধারনা পররাষ্ট্র নীতির একটি কেন্দ্রীয় ধারনায় পরিণত হয়েছে। জাতিয় স্বার্ধের ধারনার প্রবক্তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রই নিঃস্বার্থভাবে আন্তর্জাতিক রাজনিতিতে কোন ভূমিকা পালন করে না। প্রতিটি রাষ্ট্রীয় নিতি, কর্মসূচী এবং সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং জাতিয় স্বার্থের বাস্তবায়নের জন্যই তাদের প্রোগ করা হয়। যোসেফ ফ্রাঙ্কেল উল্লেখ করেছেন, অনেক রাজনৈতিক তাত্ত্বিক এবং দাশনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করেন যে, ব্যক্তির সাথে ব্যাক্তির সম্পর্ক যেমন লাভ ক্ষতির দ্বারা পরিচালিত হয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও তেমনিভাবে লাভ ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিত থেকে পরিচালিত হয়। এই লাভ ক্ষতির হিসেবেই হোল জাতীয় স্বার্থ।

মরগেনথাউ এর মতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল বিষয়বস্তু জাতীয় স্বার্থের ধারনার মধ্যেই নিহিত। এই ধারণা সময় ও স্থানের দ্বারা কোন্যাবেই সীমিত নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, জাতীয় স্বার্থের ধারনা অপরিবর্তিত। যে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারিত হয়, তার উপরই জাতীয় স্বার্থের ধারনা নির্ভরশিল।

মরগেনথাউ এর মতে, জাতিয় স্বার্থের ধারনার সাথে অস্তিত্বের বিষয় জড়িত। এই অস্তিত্ব বলতে তিনি কোন জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের ভৌগলিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে অন্য রাষ্ট্রের আগ্রাসনের আত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছেন। তাঁর ধারনা অনুসারে বিরোধপূর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের মধ্যে আপসের ফলে জাতীয় স্বার্থের উদ্ভব ঘটে। জাতীয় স্বার্থ নিরন্তর আভ্যন্তরীন

রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ফল। সরকারই চূড়ান্ত জাতিয় স্বার্থমুখি নীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং তাকে প্রয়োগ করার দায়িত্ব গ্রহন করে। তাঁর মতে, প্রত্যক দেশের জাতীয় স্বার্থ তার সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। কোন দেশের স্বার্থের সঙ্গে অন্যান্য দেশের স্বার্থের সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব তিনি কূটনীতি বিদের ওপর ন্যাস্ত করেছেন। তাঁর মতে, জাতীয় প্রত্যেক দেশের জাতিয় স্বার্থ তার সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। কোন দেশের স্বার্থের সঙ্গে অন্যান্য দেশের স্বার্থের সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব তিনি কূটনীতি বিদ্‌দের ওপর ন্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে, জাতীয় স্বার্থের ধারণা কেবল নিজের জাতির স্বার্থের ধারনা সম্পর্কেই সচেতন থাকে না। অন্য জাতির স্বার্থ সম্পর্কেও সচেতন থাকে।

টিপ্পনী

ফ্রাঙ্কেলের মতে, বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের ধারনাই হল মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। তিনি জাতীয় স্বার্থকে সকল জাতীয় মূল্যবোধের সমন্বয় রূপে অভিহিত করেছেন। সংলাপে জাতীয় স্বার্থের অর্থ ব্যাখ্যা করা কষ্টসাধ্য। কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ বলেতে কি বোঝায়, তা ব্যাখ্যা করা ও দুঃসাধ্য। জাতীয় স্বার্থের ধারণা কোন রাষ্ট্রের আশাআকাঙ্খা বর্ণনা করতে পারে। অধ্যাপক ফ্রাঙ্কেল তাঁর 'National Interest' গ্রন্থে জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

জাতীয় স্বার্থের লক্ষ্য :

জাতীয় স্বার্থের ধারনা নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই কারণে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের পরিবর্তনের ফলে জাতীয় স্বার্থের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সাধারণত জাতীয় স্বার্থের লক্ষ্য রূপে আত্মরক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয় কল্যাণ, মর্যাদা, শক্তি সংরক্ষণ, মতাদর্শ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ও প্রবণতাকে উল্লেখ করা হয়। জাতিয় স্বাধীনতা এবং ভূখন্ড অখন্ডতা রক্ষার মাধ্যমেই কোন জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব। জাতীয় সার্বভৌমত্ব, সংহতি এবং ভূখন্ডগত অখন্ডতা রক্ষার পরেই কোন রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে পারে। জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি ও প্রভাব বিস্তার এসবের পরবর্তী লক্ষ্য।

আগ্রাসন পরিহার ও প্রতিরোধ, শান্তি প্রতিষ্ঠা, নিরস্ত্রী করণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণ, বিরোধ দূরীকরণ, কোন বিশেষ মতাদর্শনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা

টিপ্পনী

ও জাতীয় স্বার্থের লক্ষ্য। তবে প্রত্যেক জাতীর জাতীয় স্বার্থের ধারনার সঙ্গে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার বিবেচনাই প্রাধান্য অর্জন করে।

রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজ নিজ জাতিয় স্বার্থের ধারনার দ্বারা পরিচালিত হন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা কোন ক্ষেত্রেই অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে মতৈক্যে উপনীত হন না। পক্ষান্তরে তারা জাতিয় স্বার্থের ধারনার ভিত্তিতেই পারস্পরিক আলাপ আলোচনা করেন। কোন রাষ্ট্রনেতা তখনই অন্য কোন রাষ্ট্রকে সুযোগ সুবিধা দানের বিষয়ে বিবেচনা করেন যখন তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে হন যে, এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেই জাতিয় স্বার্থকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

জাতীয় স্বার্থের বিকল্পন ধারনা এখনও পর্যন্ত অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। কোন দেশেদর বিদেশনীতি জাতিয় স্বার্থের ধারনাকে অতিক্রম করে গড়ে ওঠেনি এবং কোন অবস্থাতেই গড়ে ওঠা সম্ভব ও নয়। বিদেশ নীতি কোন অবস্থাতেই জাতিয় স্বার্থ বহীর্ভূত কোন পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠে না। আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থের ধারনাই নির্ধারকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

বিদেশনীতি প্রণয়নে রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া এবং কৌশল :

আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্যরুপে সকল রাষ্ট্রই পরস্পরের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ। এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেরই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিগত একশ বছরে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। একই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে পারস্পারিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশের প্রকৃতি। তবে ইচ্ছা বা অণিচ্ছা সত্ত্বেও ছোট বড় প্রতিটি রাষ্ট্রকেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক তার একটি সাম্ভাব্য রূপরেখা তারা নিজেরাই তৈরী করে। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে, সম্পর্কের এই সম্ভাব্য রূপরেখা এবং প্রত্যাশীত প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রতাশা সর্বদা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে না। কিভাবে চললে বিরোধীদের কৌশলের খেলায় পরাজিত করে সর্বাধিক পরিমাণ স্বার্থ রক্ষা এবং উদ্দেশ্য পূরণ করা যায় তার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রই চেষ্টা করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বাস্তবে সহযোগিতা, বিরোধ বা সংঘর্ষ এবং

প্রতিযোগিতা এর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

(ক) সহযোগিতা :

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এবং প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ এবং পরিমাপের একটি মানদন্ড হল সহযোগিতা। সহযোগিতা বলতে এমন এক পরিবেশকে বোঝায় যেখানে সকল রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ বা সংঘর্ষ এবং প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি বলতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি আদর্শ শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায়।

সহযোগিতার প্রকৃতি ও ধরণ সম্পর্কে বিশেষ অনুধাবন প্রয়োজন । সহযোগিতায় ধরণ আংশিক এবং সার্বিক হতে পারে। আংশিক স্যোগিতা বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝার যেখানে সকল বা বেশিরভাগ রাষ্ট্র সীমিত কয়েকটি বিষয়ে পরস্পরের সহযোগিতা করে। বাকি ক্ষেত্রে মতৈক্য বা মতানৈক্য থাকতে পারে। তবে এই সব বিষয়ে কোনো প্রকার সংঘনর্ষে জড়িত হয়না। ভারত পূর্বতন সোভিয়েত চুক্তি আংশিক সহযোগিতার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সার্বিক সহযোগিতা বলতে সকল ক্ষেত্রেই সহযোগিতা বোঝায়। এই ধরণের পরিস্থিতি আদর্শ পরিস্থিতি কিন্তু বাস্তবে এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেনি । আংশিক সহযোগিতাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সহযোগিতায় প্রধান ধরনে পরিণত হয়েছে।

সহযোগিতার আরেকটি ধরণ ও বিশেষভাবে উল্লেখ্যন সহযোগিতা আঞ্চলিকন ও বিশ্বব্যপী হতে পারে। আঞ্চলিক সহযোগিতা বলতে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা স্থাপনের পরিস্থিতিকে বোঝায় । যেমন - সার্ক, আশিয়ান, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রভৃতি সংস্থার নাম উল্লেখযোগ্য। আমার বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা বলতে সকল দেশের মধ্যে সহযোগিতাকে বোঝায় । সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনে উৎসুক হতে পারে না । একমাত্র সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সর্ব বিষয়ে সহযোগিতার ভিত্তইতেই গড়ে উঠতে পারে সর্বজনীন সহযোগিতা। তবে বিশ্বব্যাপী সর্বিক সহযোগিতা কল্পনাবিলাস মাত্র।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(খ) বিরোধ বা সংঘর্ষ :

সহযোগিতা আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া প্রকাশের একটি সর্বজন স্বীকৃত মানদন্ড। বিরোধ হল সহযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া। জাতীয় জীবনে রজনৈতিক, আর্থনৈতিক, সামাজিক, আঞ্চলিক, জাতি ও বর্ণত্রাত বিষয়কে কেন্দ্র করে বিরোধের উন্মেষ ঘটে। আন্তর্জাতিক সমাজ ও বারবার আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধ ও সংঘর্ষের শিখরে পরিণত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধ বলতে এক বিশেষ ধরনের পরিস্থিতিকে বোঝায়। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন বিরোধ জনিত পরিস্থিতিতে লিপ্ত হয়। যুদ্ধ হল বিরোধের চরম পরিণতি। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়া ও বিরোধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। ভূখন্ডজাত অধিকার সম্প্রসারণ, মতাদর্শগত পার্থক্য, ধর্ম, জাতি বিদ্বেষ, সীমানা বিরোধ, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ, কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, জাতীয় আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রয়াসকে আন্তর্জাতিক বিরোধ ও সংঘর্ষের কারণরূপে উল্লেখ করা যায়।

(গ) প্রতিযোগিতা :

বিরোধের পাশাপশি সহযোগিতার অন্তিম সকল জাতির পারস্পরিক সম্পর্কের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নিরন্তর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রই অন্যকে অতিক্রম করতে উদ্যোগী। প্রতিটি রাষ্ট্রই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। সুতরাং প্রতিযোগিতাই রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া প্রকাশের মুখ্য ধরণ। প্রতিযোগিতাই সার্বিক বিরোধ এবং সহযোগিতার মধ্যে এক কার্যকর ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতাও সর্বত্র স্থায়ি নয়। তা কখনো সংঘর্ষের আবার কখনো বা সহযোগিতায় রপান্তরিত হয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেবিরোধ, প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতার মিশ্রণ বলা যায়। আনবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধ দূর করা সম্ভব হয়নি। বৃহৎ শক্তি সমূহের মধ্যে সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আনবিক শক্তির দিক থেকে শক্তিশালী কোন রাষ্ট্র প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম। সে অন্য শক্তিকে ভীতি প্রদর্শণের মাধ্যমনে বিরোধ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা কচরতে পারে। ঠিক একই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি সহযোগিতার অস্তিত্ব ও বিদ্যমান।

টিপ্পনী

বিদেশণীতির কৌশল :

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সব হাতিয়ার এবং কৌশল ব্যবহার করাহয়, তাদেদর মধ্যে কূটনীতি ও আলাপ আলোচনা, প্রচার, অর্থনৈতিক নীতি, হস্তক্ষেপ অস্ত্র এবং যুদ্ধই হল প্রধান। কোন রাষ্ট্র কখনও কূটনীতি ও আলাপ আলোচনার তুলনায় অর্থনৈতিক নীতির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাতিয়ার ও কৌশলের গুরুত্ব এবং ভূমিকা এই কারণেই আলোচনা করা হল।

কূটনীতি :

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্কের সাথে কূটনীতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা যত বাড়ছে কূটনীতির গুরুত্ব তার সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে ততই বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিককালে কূটনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। তবে বিদেশ নীতির একটি হাতিয়ার হিসাবে কূটনীতির প্রয়োগ বেশী দিনের নয়। প্রাচীনকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি হিসাবে কূটনীতির উদ্ভব ঘটেছিল। প্রাচীন চীন, ভারত, মীশর, গ্রীস, রোম, ইতালি প্রভৃতি রাষ্ট্রের কূটনীতির কলা কৌশল উদ্ভাবিত এবং বিকশিত হয়েছিল। সেই সব রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের মাধ্যমে এক রাষ্ট্র অন্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের মিমাংসা করত।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উৎসাহ কূটনীতির মৌলিক পূনরগঠনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল। এরফলে কূটনৈতিক পদ্ধতি এবং বিধি নিয়মের ক্ষেত্রে একটি সুসংবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ কাঠামো গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে

টিপ্পনী

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাধারণ ধারনায় এই সুযোগের পরিবেশ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্পর্খে সকল রাষ্ট্রের উৎসাহ কূটনৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। শক্তি সাম্য বজায় রাখা ছাড়া ইউরোপের তৎকালিন বহু রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থপূরণের অসুবিধে ছিল । সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় জাতীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্যও কূটনীতিকে পরিচালনা করা হয়েছে। নতুন পরিস্থিতিতে স্বরযন্ত্রের পরিবর্তে চারিত্রিক সংহতি বিশ্বাস এবং সততা কেন্দ্রিক বোঝাপড়ার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এরফলে কূটনীতি রাষ্ট্রীয় নীতির একটি প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতকেও কূটনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। সংযোগে ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি। জনমতেদর গুরুত্ব সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি এবং বিভিন্ন জাতীয় ঐক্যবদ্ধ কাঠামোর বিষয় নিয়ে এক নতুন কূটনৈতিক অধ্যায়ের সুচনা হয়েছে।

কূটনীতি সম্পর্কে সাধারণ ধারনা হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যেও সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং কৌশলের প্রয়োগ। কিন্তু এই সংজ্ঞা পর্যাপ্ত নয়। The Oxford English Dictionary কূটনীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছে, কূটনীতি হল আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে পরিচালনার সংস্থা, অথবা কূটনীতি সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য নির্মান ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়।

মরগেনথাউ কূটনীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে কূটনীতি বলতে বোঝায় সকল স্তরে পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ। আবার অনেকের মতে, কূটনীতি হল পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের একটি হাতিয়ার। এমন ধারণাও যুক্ত করা হয় কূটনীতি কেবল পররাষ্ট্রনীতি প্রনয়ন করে না, পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যাও করে। সংক্ষেপে বলা যায়, কূটনীতি হল এমন একটি প্রক্রিয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যেও সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা কার্যকর করা হয় , বিভিন্ন সরকারের মধ্যেও আলাপ আলোচনা পরচালিত হয় এবং পররাষ্ট্রনীতিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়।

কূটনীতি ও বিদেশনীতি :

কূটনিতি ও বিদেশনীতির মধ্যেও পার্থক্যের সুস্পষ্ট ধারনা ছাড়া কূটনীতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কূটনীতি হল রাষ্ট্রের লক্ষ্যপূরণ এবং জাতিয় স্বার্থ রক্ষার একটি মাধ্যম। তাছাড়া কূটনীতির মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু কূটনীতি এবং বিদেশনীতি একই বিষয় নয়।

টিপ্পনী

পামার এবং পারকিন্‌স্‌ এরমতে কূটনীতি বিদেশনিতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা এবং লোকজন সরবরাহ করা। একটি হল বিষয়বস্তু, অন্যটি পদ্ধতি। অর্থাৎ তাঁদের মতে কূটনীতি হল বিদেশনীতি প্রয়োগের একটিই পদ্ধতি মাত্র।

কূটনীতির মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতি কার্যকর হয়। পররাষ্ট্রনীতি প্রনয়নে কূটনীতি ছাড়াও অর্থনৈতিক, সামরিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। পররাষ্ট্রনীতি কার্যকর করার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী, প্রতিরক্ষা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, গোয়েন্দা বাহিনী, প্রচার কার্য, অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও কৌশল প্রয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কূটনৈতিক পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কূটনীতির মাধ্যমে বিদেশনীতি সংক্রান্ত সকল তত্ত্ব বাস্তবায়িত হয়। বিদেশনীতি প্রয়োগের মুখ্য মাধ্যমরূপে কূটনীতি স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

কূটনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতি পরস্পরের উপর নির্ভরশিল। পররাষ্ট্র নীতি প্রনয়নের জন্য আধুনিক রাষ্ট্রের কর্ণধার গন বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করেন। বিশ্বস্থ সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য ছাড়া বিদেশনীতির মত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো নীতি প্রনয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ তথ্য এবং সংবাদেদর অন্যতম প্রধান উৎস। তারা পররাষ্ট্রনীতি প্রনয়ন এবং প্রবোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কূটনীতির কার্যাবলী :

কূটনীতি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মরগেনথাউ কূটনীতিকে জাতীয় শক্তির অপরিহার্য উপাদান হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি কূটনীতির চারটি মৌলিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন :

টিপ্পনী

(১) কূটনীতি বাস্তব এবং সম্ভাব ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্য পূরণের পদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

(২) কূটনীতি অন্যান্য জাতী সমূহের লক্ষ্য অণুধাবন ও মূল্যায়ন করবে এবং লক্ষ্য পূরণের জন্য তাদের প্রকৃতি ও সম্ভাব্য ক্ষমতার বিবেচনা করবে।

(৩) ঐসব লক্ষ্য পরস্পরের সঙ্গে কতটা সঙ্গতী পূর্ণ তা নির্ধারণ করবে।

(৪) নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য কূটননীতি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিভিন্ন তাত্ত্বিকদেদর আলোচনার ভিত্তিতে কূটনীতির প্রধান কার্যাবলীগুলি আলোচনা করা হল -

প্রতীকী কার্যাবলী :

কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূতদের অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব হল প্রতীকী প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করা ।এইসব কাজের মাধ্যমে বিদেশে যেকোন দেশের সম্মানে ও মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের বা অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূত বিদেশে নিজ দেশের রাষ্ট্র প্রধানের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।

প্রতিনিধিত্মমূলক কার্যাবলী :

কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত বিদেশে নিজের দেশের আইনগত প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। বিদেশে কূটনৈতিক প্রতিনিগণকে দেশের হয়ে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরে অনুমতি দান করতে পারে। বিদেশে নিজ দেশের নাগরিকদের অধিকার ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব ও তাকে পালন করতে হয়। কোনো রাষ্ট্রদূতকে তার নিজের দেশের সরকার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পন করতে পারে।

বিদেশ নীতি প্রনয়নে সাহায্য দান :

কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিজ দেশেদর পররাষ্ট্র দপ্তর এবং বর্হীবিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সাধনের মাধ্যম রূপে কাজ করেন। বিদেশী সরকারের লক্ষ্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ সরবারহ করে। কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ সরকারী সূত্র, সংবাদপত্র এবং গোপনীয় পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং গোয়েন্দা সূত্র থেকেও তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করেন। তিনি সংগৃহীত তথ্য ও সংবাদ স্বদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরে পেশ করেন।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংযোগ সাধন :

কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিজে রাষ্ট্র এবং বিদেশী রাষ্ট্রের মধ্যেও সংযোগ সাধনের সূত্র রূপে কাজ করেন। দুতি রাষ্ট্রের মধ্যেশান্তি স্থাপন, পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসানের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কোন অবস্থায় আলোচনা ও বোঝাপড়ার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে,আবার কোন আবস্থায় বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করতে হবে এ বিষয়ে রাষ্ট্রদূত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচলিত হন।

আলাপ আলোচনামূলক কার্যাবলী :

কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের অন্যতম প্রধান দাবিত্ব হল আলাপ আলোচনা পরিচালনা করা। কূটনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনাকারী রাষ্ট্রদূত নিজের দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি রূপে অন্যদের সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন।এই দায়িত্বের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির খসড়া রচনা কর, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংগঠন গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, ভ্রমণ ইত্যাদি কার্যকলাপ সংযুক্ত।

প্রচারনা :

আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় আচরণের ক্ষেত্রে প্রচার কার্যের ভূমিকা স্পর্কে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রচার কার্যকে পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের একটি মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ার বলা হয়। এই মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ারের দুটি উদ্দেশ্যও হল - জন সাধরের সমর্থনের ভিত্তইকে শক্তিশালী করার জন্য দেশের অভ্যন্তরে জনমতেদর রূপান্তর সাধন এবং বন্তুত্ব অর্জন ও অন্যান্য জাতী সমূহকে প্রভাবিত করায় জন্য বিদেশি নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন।

সাম্প্রতিক কালের প্রচারকার্য গুণগত ও পরিমাণগত দিক থেকে আগের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা ব্যাপকতা ও কার্যকারীতার দিক থেকে এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছে যার ফলে প্রচার কার্যের পরিধিকে পূর্বের তুলনায় প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছে।

মরগেনথাউ এর মতে, প্রচার কার্য পররাষ্ট্রনীতির এক স্বয়ংশাসিত হাতিয়ার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পরিণত হয়েছে। কূটনীতি ও যুদ্ধের সঙ্গে প্রচার কার্য বিদেশনীতির তৃতীয় হাতিয়ার রূপে পরিচালিত হয়েছে বলে তনি মনে করেন। তাঁর মতে পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হল বিরোধীদের মন জয়ের মাধ্যমে নিজের স্বার্থ রক্ষা করা। প্রচারকারি নিজ স্বার্থের জন্য সরারি অন্যের মনকে প্রভাবিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রচার কর্য বিদেশনীতির অভিনব কৌশল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

প্রচারণা বা প্রচারকার্যের সংজ্ঞা :

প্রচারকার্যের কোন সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা নেই। প্রচারকার্য সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তক এবং প্রবন্ধে প্রচারকার্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা দান করা হয়েছে। হলস্টির মতে সকল প্রকার সংযোগ গঠন অথবা পররাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তনের জন্য অনুষ্ঠিত কূটনৈতিক আদান প্রানকে প্রচারকার্য নামে অভিহিত করা যায় না।

সাধারণভাবে প্রচারকার্য বলতে বন্ধুত্ব অর্জন এবং প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে সম্প্রচারিত সংবাদ ধ্যান- ধারনা, প্রভাব অন্যকে আনার প্রচেষ্ঠার সমন্বয়কে বোঝায়। টেরেন্স কোয়ালটার উল্লেখ করেছেন, সংযোগ গঠনের হাতিয়ারের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কতৃক অন্য গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তনের পরিকল্পিত প্রচেষ্টাই হল প্রচারকার্য।এই সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে প্রচারকার্যের চারটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :-

(১) একজন সংযোগকারীর প্রয়োজন, যার উদ্দেশ্য হল অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত ও আচরণকে স্বমতে আনা ;

(২) সংযোগকারী কতৃক লিখিত, মৌখিক আচরণ সম্পর্কিত প্রতীক ব্যবহার

(৩) সংযোগ গঠনের মাধ্যম;

(৪) শ্রোতৃমন্ডলীকে আধুনিক জনমত সম্পর্কিত আলোচনার নিশানা হিসেবে চিহ্নিত করা।

অধ্যাপক ফ্রাঙ্কেল এর মতে, সাধারণভাবে প্রচারকার্য বলতে বোঝায় সরকারী লক্ষ্যপূরণের জন্য কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠির মানসিকতা, অনুভূতি এবং কার্যক্রমকে সুসংবদ্ধ ভাবে প্রভাবিত করার প্রয়াস।

প্রচারকার্যের নিশানা :

প্রচারকার্য সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনার জন্য প্রচারকারীকে প্রথমে লক্ষ্যবস্তু স্থির করতে হয়। প্রচার কার্যের লক্ষ্যবস্তু হল -

প্রথমত :

প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজের দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্য পরিচালনা করে থাকে। সরকারের বক্তব্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের দ্বারা বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোবল ও ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা সৃষ্টি করা হয়।

দ্বিতীয়ত :

শত্রুভাবাপন্ন দেশের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য পরিচালনা করা হয়। তাদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত তথ্য, সংবাদ ও প্রচারকার্যের মাধ্যমে বৈরি মনোভব ও দৃষ্টিভঙ্গি দূরীকরণ, কোন কোন অংশের মধ্যে বন্ধুত্বের মনোভব সৃষ্টি এবং নাশকতা বিরোধী কার্যকলাপে উৎসাহিত করা।

তৃতীয়ত :

কোন দেশের সরকার তার প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন দেশের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য পরিচালনা করে। এই ধরনের প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য হল তাদের নিরপেক্ষতার মনোভাবকে শক্তিশালী করা অথবা নিরপেক্ষতাকে সক্রিয় সর্ম্থনে রূপান্তরিত করা।

চতুর্থত :

বন্ধুভবাপন্ন দেশের জনগণের জন্য ও প্রচারকার্য পরিচালিত হয়। তবে এই প্রচারকার্যের লক্ষ্য হল বন্ধুত্ব দৃঢ়করণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ।

প্রচারকার্যের কৌশল :

আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় প্রচারকার্যের গুরুত্ব সম্পর্কে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এবং সংযোগের সূচনা থেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রচারকার্যের সাহায্যে প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের মতামত এবং বক্তব্যের প্রতি অন্য রাষ্ট্র এবং তার নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করে ধীরে ধীরে বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে প্রচারকার্যের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পরিবর্তনসাধিত হয়েছে। নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রাষ্ট্রের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং গৃহীত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

প্রচারকার্যের প্রাথমিক কৌশল হল প্রচারের বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি। প্রচারকারী কিভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করবে সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতি থাকতে পারেনা। পরিস্থিতি অণুযায়ী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও প্রচারকার্যের নিশানা অণুযায়ী প্রচারকারীর বক্তব্য পরিবেশের পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। প্রচারক নিজের মুক্তির সমর্থনে অনেক সময় বিভ্রান্তিকর তথ্য বা জাল নথির সাহায্য গ্রহন করে।

প্রচারকার্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল দৃষ্টি আকর্ষনের কৌশল। প্রচারকারী শুধু প্রচারের কার্য পরিচালনা করেনা, তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে। অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষন ও তারো প্রভাবিত করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণেই প্রচারকারী রাষ্ট্র বা সংঘ প্রচারের হাতিয়ারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রচারকারী অন্য রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করবে কিনা তা প্রচারকারীর বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল।

প্রচারকার্যের সর্বশেষ কৌশল হল অন্য রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা জনসাধারণকে প্রচারকারীর মতামত গ্রহণ করানো। মতামত গ্রহণ করানোর পদ্ধতি কি হওয়া উচিত তা নির্দিষ্ঠভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কারণ মতামত গ্রহণ করানো নির্ভর করে প্রচারকারীর সার্মাথ্য ও নিশানাকৃত রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং জনসাধারণের সংবেদনশিলতার ওপর। অন্যকে মতামত গ্রহণ করানোর জন্য বিশ্বাসযোগ্য ভবে প্রয়োজনীয় তথ্য। সংবাদ ও পরিসংখ্যান সরবরাহ করতে হয়।

সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যে, ছোট বড় সকল রাষ্ট্রই কোন না কোন কোনভাবে প্রচারকার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রচারকার্য শুধু সরকারী স্তরেই পরিচলিত হয়না, ব্যাক্তিগত পর্যায়েও প্রচারকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজনের দৃষ্টি কোন থেকে প্রচারকার্য পরিচালনা করে। এই কারণেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রচারকার্যের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে। আর এই

পার্থক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই গড়ে ওঠে প্রচারকার্যের কৌশল গত ভিত্তি।

কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি : ভারত, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ও চীন :

টিপ্পনী

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক হোল আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম আলোচ্য বিষয় ল এই সম্পর্ক বিদেশনীতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে থাকে । এই কারণেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞনাম আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থাৎ বিদেশনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কোন্ কোন্ উপাদানের দ্বারা কোন্ দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রভাবিত হয় - এই সব বিষয় গুলি পররাষ্ট্রনিতির প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি রাষ্ট্রই তার বিদেশনীতির মাধ্যমে কেবল অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকে না; সামগ্রীকভাবে আন্তর্জাতিক পরিবেশের প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে থাকে। এই কারণেই বিভিন্ন দেশের বিদেশ নীতির ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ধারাটি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

বর্তামনে জাতিপুঞ্জের ১৯৪ টি দেশের প্রত্যেকটির বিদেশনীতি আছে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কয়েকটি বৃহৎ রাজ্য ভারত, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের বিদেশনীতি আলোচনা করা হল।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি :

দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান শক্তিরূপে ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজের স্থান করে নিয়েচে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে একাতিক্রমে ভারত শুধু এশিয়া নয়, সমগ্র বিশ্বে নিজের প্রভাবের ছাপ ফেলেছে। নির্জোট আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, আন্তঃরাৎত্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে পঞ্চশিলের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ ভারতকে শান্তি প্রতিষ্ঠার এক স্থপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিরস্ত্রীকরণ, উপনিবেশকের নির্মূলকরণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সহপ্রতিটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করেছে। ঠান্ডাযুদ্ধের ও দ্বি-মেরুপ্রবণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলতার মধ্যে ভারত এক নেতৃত্ব প্রদানকারী শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত

টিপ্পনী

করতে সক্ষম হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের আন্দোলন, উত্তর-দক্ষিন আলোচনা, দক্ষিণ- দক্ষিণ সহযোগিতা, শান্তির জন্য আনবিক সক্তিকে প্রয়োগ সহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভারতের ভূমিকা নিয়ে কোন সংশয় ছিল না।

ভারতের বিদেশনীতি অন্যান্য দেশের মতোই ভৌগলিক অবস্থা ও উপাদান, আয়তন, সীমান্তরেখা, সমুদ্রপথের নৈকট্য, পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রের ক্ষমতা, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি, তাদের জোটপ্রতিজোট, ভারতের ইতিহাস ও নিরাপত্তা বিষয়ক ধারনা অর্থনৈতিক বিকাশ, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশে রাষ্ত্র, রাজনতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, জাতীয় স্বার্থ ও নৈতিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

ভারতের বিদেশনীতি তার ভৌগলিক অবস্থানকে কেন্দ্রকরে ও আবর্তিত হয়েছে। ভারত বিশ্বের উত্তর গোলার্ধে এবং এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। তার ভূখন্ডের মোট আয়তন ৩,২৮০,৪৮৩ বর্গ কিলোমিতার। সীমান্তরেখা ১৫,২০০ এবং উপকূলরেখা ৫,৭০০ কিলোমিটার বিস্তৃত । ভারতের পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর অবস্থিত । পশ্চিমে পাকিস্তান, উত্তরে চীন, নেপাল ও ভূটান অবস্থিত। পূর্বে বাংলাদেশ ও মায়নমার অবস্থিত। এরকম ভৌগলিক অবস্থান ভারতের বিদেশনীতির প্রণয়নে ব্যপক প্রভাব ফেলেছে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হল জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব,সংহতি এবষং নিরাপত্তা রক্ষা, অন্য দেশের ক্ষতিসাধন না করে নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার, জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করা, শান্তি সংরক্ষণ, আণবিক যুদ্ধের প্রসার রোধ, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতার প্রসার সাধন, জোট নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন, অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সমস্যায় সমাধান ইত্যাদি।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ :

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারত একটিই প্রভাবশালী দেশ। জোট

নিরপেক্ষ আন্দোলন বা তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম নেতা হিসেবে ভারত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। ভারতের বিদেশ নীতি তার স্বীকৃত রাজনৈতিক মূল্যবোধেরই প্রতিফলন। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির বাণি প্রচার করেছেন। ভারতের সংবিধানে ও তার প্রতিফলন ঘটেছে। যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ পথে সকল বিরোধের মীমাংসা করা, অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সকল সমস্যা সুষ্ঠভাবে সমাধানের ওপর ভিত্তি করেই ভারতের বিদেশনীতির মূল ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

টিপ্পনী

ভারতের বিদেশনীতি কবেকতি মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্রকরে গড়ে উঠেছে। তার মুখ্য বেশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তার মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল জোট নিরপেক্ষতা, পঞ্চশীল, উপনিবেশকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল বিরোধের মীমাংসা, তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সাধন, যুদ্ধ ও আগ্রাসনের বিরোধীতা, নিরস্ত্রীকরণ, বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্য নিরন্তর প্রয়াস, জাতি ও বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মানব কল্যানে আণবিক শক্তি প্রয়োগ ইত্যাদি।

জোটনিরপেক্ষতা :

জোট নিরপেক্ষতা ভরতের বিদেশনীতির স্তম্ভ বিদেশ নীতির স্তম্ভ বিশেষ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই ভারত নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই নীতি অনুসরণ করেছে। বিশ্বশান্তি ও নিরপত্তার স্বার্থে ভারত সর্বদাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির সামরিককরণ সামরিক জোট গঠন, বিদেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন প্রভৃতির বিরোধীতা করেছে। নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক সাহাযভ গ্রহন ও অস্ত্র ক্রয় করেছে। নিছক আত্মরক্ষার জন্যই এই অস্ত্র সংগ্রহ। ভারত ন্যটো, সিয়াটো বা সেন্টো সামরিক জোট সমূহের বিরোধীতা করেছে। কারণ, ঐ জোট সমূহ ছিল আক্রমণাত্মক, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যম ও হাতিয়ার। ঐসব সামরিক জোট আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে অস্তিতশীল করে তুলেছে।

টিপ্পনী

পঞ্চশীল নীতি :

ভারতের বিদেশনীতির ভিত্তি রূপে পঞ্চশিলের নাম উল্লেখ করা যায়। পাঁচটি নীতি হল : অন্যের ভূখন্ডগত অখন্ডতা এবং সার্বভৌমিকতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অন্যের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা, সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা করা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এই নীতির ভিত্তিতেই ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সহ পঞ্চশিলের নীতিসমূহ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান ভিত্তিগত উপাদান ও বৈশিষ্ট্য।

১৯৫৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝৌ. এন. লাই পঞ্চশীলের নীতি সমূহের বিন্যাস করেছিলেন। বান্দুং সম্মেলন, আফ্রো-এশীয় সম্মেলন, নির্জোট দেশ সমূহের সম্মেলন, কোন আন্তর্জাতিক দ্বি-পাক্ষিক সম্মেলন, জাতিপুঞ্জ সর্বত্রই ভারত পঞ্চশীলের প্রতি অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে।

বর্ণবৈষম্যের বিরোধীতা:

ভারত বর্ণ ও জাতিগত বিদ্বেষের বিরোধী। এই বিরোধ শুধু তত্ত্বগত নয়। দক্ষিন আফ্রিকা, প্রাক্তন দক্ষিন রোডেশিয়ার মুষ্টিমেয় শেতাঙ্গ শাসকদের বর্ণ-বিদ্বেষী নীতির বিরুদ্ধে আফ্রিকার বঞ্চিত মানুষের প্রতি - অকুন্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। জাতিপুঞ্জ থেকে দক্ষিন আফ্রিকার বহিস্কারে আরতের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। নির্জোত আন্দোলন, কমনওয়েলথ সম্মেলন ও জাতিপুঞ্জে ভারত বর্ণ-বিদ্বেষ অবসানের বিষয়ে সক্রিয়তা এবং আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা :

সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ভারতের বিরোধীতা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই কারণেই বিশ্বের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের অবসানকল্পে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনে কখন ও সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভারতের সহানুভূতিশীল মনোভাব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ আফ্রিকার দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা এবং

আগ্রাসন প্রতিরোধে ভারত সর্বদা সমর্থন ও সাহায্য করেছে।

নয়া উপনিবেশকদের বিরোধীতা :

সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপ হল নয়া উপনিবেশকতা। তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহই নয়া উপনিবেশকদের আগ্রাসন ও আগ্রাসনের নিশানায় পরিণত হয়েছে। ভারত উপনিবেশিক শাসকের নিন্ত্রণাধীণ সকল অঞ্চলকে মুক্ত করার আন্দোলনের শরীকে পরিণত হয়েছে। পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া, দমন,এবং দিউতে উপনিবেশিক শাসনের অবসানকল্পে অনেক পশহচিমী দেশের ভীতি প্রদর্শনকে উপেক্ষা করে ১৯৬২ সালে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহন করেছিল। নামিবিয়ার দক্ষিন আফ্রিকা সরকারের দখলদারীর অবসানের জন্য পরিচালিত আন্দোলনকে ভারত সমর্থন করেছে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থন :

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভারতের সমর্থন ছিল সর্বদাই ইতিবাচক। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন, ঘানা, দক্ষিন-রোডেশিয়া, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশে জাতিয় মুক্তি আন্দোলন এবং দক্ষিন আফ্রিকায় বর্ণ বিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি ভারতের সহযোগিতা সর্বজন বিদিত। ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি, সুয়েজখালের ব্যাপারে ইঙ্গ-ফরাসি মনোভাব, আলজেরিয়ার ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক কার্যকললাপের বিরিদ্ধে ভারত সর্বদাই সরব ছিল।

নিরস্ত্রীকরণ :

ভারত আনবিক মরনাস্ত্র উৎপাদন এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য আণবিক শক্তিকে ব্যবহারের বিরোধী। জওহরলাল নেহেরু থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত সকল প্রধান মন্ত্রীই আনবিক মরণাস্ত্র উৎপাদনের বিরুদ্ধে মতামতব্যক্ত করেছেন। শান্তির উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তিকে ব্যবহার করাই ভারতের উদ্দেশ্য। ভরতের মূল নীতি হল মারাত্মক অস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকা, নিরস্ত্রীকরণের জন্য প্রয়াস চালানো এবং আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার রোধ। কার্যকর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে সাধারণ ও সম্পূর্ণনিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্য অর্জনের অনুকূলে ভারত বারবার মত প্রকাশ করেছে। ভারত আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ও বিরোধী।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যুদ্ধ ও শান্তি :

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে ভারত সর্বদাই যুদ্ধের বিপক্ষে মত ব্যাক্ত করেছে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল প্রকার আন্তর্জাতিক বিরোধ এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহন করেছে। কোরিয়া সহ ইন্দোচীনের যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে আরব ইজরায়েল যুদ্ধ এবং ইরাক -ইরান যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় ভারত সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে। তবে আত্মরক্ষার জন্য এবং কোনো দেশের আগ্রাসি ও সম্প্রসাণবাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধে যুদ্ধ অপরিহার্য হলে ভারত তাকে সমর্থন করেছে । যুদ্ধ বর্জন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মিমাংসার অর্থ এই নয় যে, আত্মরক্ষার্থে ও যুদ্ধ করা চলে না । সম্প্রতি চীনের সঙ্গে ভারের সীমান্ত বিরোধ থাকলে ও উভয় দেশ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই বিরোধ মীমাংসার জন্য চেষ্টা চলেছে।

ভারতের বিদেশ নীতির যে সব বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে তার ভিত্তিতেই ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্পর্ক আলোচনা করা হল।

ভারত ও আফ্রিকা :

ভারতের সঙ্গে আফ্রিকার সম্পর্ক নতুন নয়। উনবিংশ শতব্দীতে বহুসংখ্যক ভারতীয় পূর্ব আফ্রিকায় যায় । ভারতের সঙ্গে আফ্রিকার বানিজ্যিক সম্পর্ক তখন থেকেই বৃদ্ধি পেতে থাকে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গান্ধিজী দক্ষিন আফ্রিকার নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে ভারত ও আফ্রিকার সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করেন।

ভারতের ঔপনিবেশিকতা ও নয়া ঔপনিবেশিকতা, জাতি ও বর্ণ বিদ্বেষ বিরোধী নীতি, জাতিয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে সাহায্যদান, আফ্রিকার দেশসমূহের ঐক্যের প্রতি গভীর আগ্রহ আফ্রিকায় দেশসমূহে অভিমন্দিত হয়েছে । নির্জোট আন্দোলন এবং যৌথভাবে জাতিপুঞ্জে অনুব্রত এবং উন্নয়শীল দেশসমূহের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম আফ্রিকা এবং ভারতকে সৌহার্দ্য ও গভীর বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে।

ভারত ও আরব রাষ্ট্রসমূহ :

ভারত এবং আরব রাষ্ট্রসমূহ বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ভারত সর্বদাই আরব

রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভূখন্ডগত অখন্ডতা এবং জাতিয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। জাতীয়তাবাদের পক্ষে এবং ঔপনিবেশিকতার বিরোধী আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই স্বাধীন ভারতের সাথে আরব রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভারতের মতো বেশীরভাগ আরবরাষ্ট্র নির্জোট আন্দোলনের শরীক। ১৯৫৬ সালে সুবেজখাল জাতিয়করণের পর ব্রিতেন, ফ্রান্স এবং ইজরায়েল কর্তক মিশর আক্রান্ত হলে ভারত মিশরের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। ১৯৬৭ এবং ১৯৭১ সালে আরব ইজরায়েল যুদ্ধেদর সময়ে ভারত আরব রাষ্ট্রসূহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। ভারত আরব রাষ্ট্রসমূহের সংহতির প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেছে। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী এবং মনমোহন সিংহ ও নরেন্দ্র মোদী ও ভারত আরব বন্ধুত্বকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন।

টিপ্পনী

ভারত-শ্রীলঙ্কা :

প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক নানাপ্রকার সংকট ও উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। উভয় দেশের সম্পর্ক নানা প্রকার উপগাথা ও পুরাণ কাহিনী এবং ইতিহাসের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।

ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ এবং সম্পর্খের প্রতি প্রকৃতির নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্থারক হল শ্রীলঙ্কার বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের নাগরিকতা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমস্যা। আশির দশকে তামিলদেদর জন্য স্বতন্ত্র তামিল ইলম গঠনের প্রয়াস ভারত শ্রীলঙ্কা সম্পর্ককে অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছিল। ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির মাধ্যমে তাকে সমাধানের চেষ্টা করা হলেও ইন্ডিয়ান পিস কিপিং ফোর্সের প্রত্যাহারের বিষয়কে কেন্দ্র করে তিক্ততা রয়েছে। বর্তমানে নরেন্দ্র মোদী এই তামিল সমস্যাকে গুরুত্ব সহকারে সমাধানের চেষ্টায় রত আছেন।

ভারত-পাক সম্পর্ক :

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে শান্তি ও মৈত্রীর সম্পর্ক, উত্তেজনা প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ব্যায় হ্রাস, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, রাজনৈতিক সুস্থিতিতে সাহায্য করে। আমার প্রতিবেশী কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাদ ও সংঘর্ষের পরিস্থিতি আঞ্চলিক

উত্তেজনা এবং অস্তিতিশিলতাই সৃষ্টি করে না, বিরোধের সাথে জড়িত রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশেও সমস্যা সৃষ্টি করে।

১৯৪৭ সালের ঐতিহাসিক পটভূমিকার মধ্যে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। পরবর্তীকালে উভয় দেশের রাষ্ট্রনেতাদের এবং জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, অসহযোগিতএবং পারস্পরিক ঘৃনার ভাব সঞ্চারিত হয়েছে। তার ফলে যে মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে কোন দেশের রাষ্ট্রনেতা ও জনগণ মুক্ত হতে পারেনি। ভারত - পাক সম্পর্ক উভয় দেশের আন্তর্জাতিক নীতি এবং দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে । দ্বিপাক্ষিক সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাশ্মীর সমস্যা, সিবাচেন হিমবাহ, পাকিস্তানের রাষ্ট্র নায়কদের দ্রুত সামরিকীকরণ নীতি, নিরন্তর ভারত বিরোধী প্রচার, আগ্রাসন প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রতিকথা সচেতনতা, পারমানবিক অস্ত্র তৈরীর উদ্যোগ, পাঞ্জাবের সন্ত্রাস বিরোধী আগ্রাসনে ইন্ধন সৃষ্টি। এই সব কারণেই সীমারেখা অতিক্রমকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক চমুক্ত, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত পাক উত্তেজনা এবং পরবর্তি কালে কার্গিলের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে।

টিপ্পনী

গ্রেট ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি :

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে ব্রিটেনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রূপে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত তার প্রভাব ও প্রাধান্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একে একে তার ওপনিবেশ আতছাড়া হাওয়ার তার অতীত গৌরব লুপ্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। তা সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতিতে তার প্রভাব এখনও অব্যাহত আছে।

গ্রেট ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে কাঠামোগত বিন্যাস :

আন্তর্জাতিক পরিবেশ এবং দেশীয় পরিবেশ দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি প্রভাবিত হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো গ্রেট ব্রিটেনেও তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখেই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন এবং তার পুনবিন্যাস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হয়েছে।

আইনসভার ভূমিকা :

গ্রেট ব্রিটেনে সংসদীয় সরকার বর্তমান। এই সরকারের কাঠামোর অন্যান্য নীতির মত পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের আনুষ্ঠানিক কেন্দ্র হল পার্লামেন্ট । কিন্তু আইনসভায় বিদেশনীতি নিবে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভূমিকা কেবল আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যেই সীমীত । পার্লামেন্টের সদস্যগণ সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকলেই পররাষ্ট্রনিতি প্রনয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

টিপ্পনী

শাসনবিভাগের ভূমিকা :

গ্রেট ব্রিটেনের বিদেশ নীতি প্রনয়নে শাসন বিভাগই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি রাজা বা রানির নামে ঘোষিত হলে ও তাঁর শাসকতা নিছক আলঙ্কারিক, মূল ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেট । প্রধানমন্ত্রি তাঁর কিচেন ক্যবিনেট, নিজস্ব সচিবালয়, পরামর্শদাতা ও বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুযাবি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

আমলাদের ভূমিকা :

আধুনিক অন্যান্য রাষ্ট্রের মত গ্রেট ব্রিতেনেদর পররাষ্ট্র নীতি প্রনয়নে আমলাদের ভূমিকাই প্রাধান্য অর্জন করেছে। দীর্ঘকালব্যপী প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ধাকার অভিজ্ঞতা তাদেদর দক্ষতা ও পারদর্শিতাকে প্রসারিত করে। তাঁরই প্রতি নিয়ত সরকারী ও বেসরকারী সুত্র থেকে পররাষ্ট্র সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং তার বিন্যাস সাধন করেন। এই সব তথ্যের ভিত্তইতেই প্রধানমন্ত্রি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নীতি নির্ধারণে রাষ্ট্রকতৃক ছাড়াও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা ও উপদেষ্টা, সামরিক বাহিনী, অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি, গোয়েন্দা দপ্তর, প্রচার মাধ্যম প্রভৃতি মাধ্যমে গ্রেট ব্রিটেনের বিদেশ নীতি প্রণয়নে সহযোগী ভূমিকা পালন করে।

গ্রেট ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য :

গ্রেট ব্রিটেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিদেশনীতি প্রণয়নে কয়েকটি নীতি অনুসরণ করেছে। এই নীতিগুলিই হল আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটেনের দিক্ নির্দেশিকা। এই নীতি সমূহ হল : -

টিপ্পনী

(১) নিজের ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রাক্তন উপনিবেশ সমূহের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সর্বদাই সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

(২) গ্রেট ব্রিটেন নিজের অর্থনৈতিক দুর্বলতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বিষয়ক পরিকল্পনা, মার্শাল পরিকল্পনার সাথে নিজেকে মুক্ত করেছে।

(৩) কমনওয়েলথের মাধ্যমে ব্রিটেন নিজের আন্তর্জাতিক স্বার্থ এবং প্রভাস বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

(৪) গ্রেট ব্রিটেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সামরিক জোটে অংশগ্রহনের মাধ্যমে নিজের জাতীয় নিরাপত্তাকে সংরক্ষিত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। ন্যাটো, বাগদাদ চুক্তি জোটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রেট ব্রিটেন আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করেছে।

(৫) গ্রেট ব্রিটেন সাধারণভবে নিরস্ত্রীকরণের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করেনি। প্রথাগত সামরিক শক্তি এবং আণবিক মারণাস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করেছে।

(৬) গ্রেট ব্রিটেনের বিদেশ নীতির মতাদর্শগত ভিত্তি হল সমাজ তন্ত্রের বিরোধীতা। এই কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন সমাজতান্ত্রিক জোটের বিরোধী হিসেবে নিজেকে পরিণত করেছে।

গ্রেট ব্রিটেনের বিদেশনীতির বিভিন্ন অধ্যায় ও বিশিষ্ঠতা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গ্রেট ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতিকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করলেও ১৯৪৫ - ১৯৫৫ কে প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ঐ সময় তার বৃহৎশক্তির মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। তার বিশাল সাম্রাজ্য কমনওয়েলথ-এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৫৬ সালের সুয়েজ অভিযানের মাধ্যমে যুদ্ধোত্তর গ্রেট ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতির দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধীরে ধীরে তার প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করে এবং ব্রিতেন একটি ইউরোপীয় শক্তিতে পরিণত হয়।

উপনিবেশিক মনোভাব :

গ্রেট ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরে ও বাইরে উপনিবেশিকতাকে সমর্থন ও সাহায্য করা। প্রাক্তন উপনিবেশ সমূহের জাতীয় ও সাহায্য করা। প্রাক্তন উপনিবেশ সমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমনের জন্য ব্রিটেন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। এশিয়া আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিরোধীতার নীতি অবলম্বন করেছে। ইন্দোচীন, সুদূরপ্রাচ্য, দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা গৃহীত নীতিকে গ্রেট ব্রিটেন সমর্থন করেছে।

টিপ্পনী

যুদ্ধ সজ্জা :

সমর সজ্জার দিক থেকে গ্রেট ব্রিটেন ক্রমশ অগ্রনী ভুমিকা গ্রহন করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গ্রেট ব্রিটেণ ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু রুপে পচরিগণিত হয়েছে। ইউরোপে একমাত্র গ্রেট ব্রিটেনও ন্যাটো সেন্টো এবং সিয়াটো সামরিক জোটের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। তার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইউরোপীকরণের প্রবণতা থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনে তার মাত্রাতিরিক্ত উদ্যোগ ছিল।

অর্থনীতির সামরিকীকরণ :

গ্রেট ব্রিটেন বিগত কয়েক বছর ধরে অর্থনীতিকে সামরিকীকরণের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার বাজেট বরাদ্দ্ ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৫ - ৮৬ সালের বাজেট সামরিক খাতে মোট জাতিয় উৎপাদনের ৫.৪% অর্থাৎ ১৭০০ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১৯৮০ সালে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন শিল্পে ৭ লক্ষ কর্মী নিযুক্ত ছিল। অস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের পরেই ব্রিটেনের স্থান। অর্থাৎ প্রত্যেক আর্থিক বছরে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের জন্য বাজেটের বিরাট অংশ ব্যায় করে গ্রেট ব্রিটেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন :

গ্রেট ব্রিটেন ইউরোপীয়ান কমিউনিটি অধুনা ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি শক্তিআলী সদস্য রাষ্ট্র। ১৯৯১ সালে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন সহ কয়েকটি বিষয় নিয়ে মাসস্ত্রিম চুক্তির খসড়া প্রনীত হয়। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ২৭। অতি সম্প্রতি ব্রিটেনে গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ব্রিটেন ইউরোপীয়

ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসবে যা BREXIT হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে।

ভারত - ব্রিটেন সম্পর্ক :

ভারত-ব্রিটেন সম্পর্ক বিভ্রান্ত দুই দশকে বিশেষভাবে গুণগত দিক থেকে পরিবর্তিত হয়নি । ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণীজ্যিক লেনদেন পূর্বের মতই অবভাহল রয়েছে। ১৯৯৪ সালে ভারতের সঙ্গে প্রত্যাপর্ন চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঐ চুক্তি অণুসারে ভারত থেকে যে সব অপরাধী ব্রিটেনে আশহরয় গ্রহণ করবে ব্রিটিশ সরকার তাদের বিচারের জন্য ভারতে প্রত্যাপর্ন করবে। তবে সম্প্রতি বিজয় মাল্য বা ললিত মোদীর প্রত্যার্পণ নিয়ে টালবাহানা তৈরী হয়েছে।

টিপ্পনী

অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত ব্রিটেন সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে। অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে ভারত - সরকারের নীতি - ব্রিটিশ ব্যাক্তিগত পুঁজির অবাধ প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যপক পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক রাজনীতির ক্ষেত্রে গুণগত এবং পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই পরিবর্তনের একটি স্মরনীয় দিক হল একটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্ররূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তথান। ১৯৪৫ সালের পর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মত দুটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের পারস্পরিক নীতির সংঘাত এবং সমঝোতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে সোভিবেত ইউনিয়নের ভাঙনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রাধান্যের দ্বারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে আসছে। দ্বিমেরু প্রবণতা বিলীন হয়েছে, বিশ্ব রাজনীতি এখন একমুখী হয়ে পড়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহ :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে একটি সংগঠিত রূপ লাভ করেছে। এই সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে সমারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত বিচার-বিবেচনার দ্বারা মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে নিজের সম্পদ এবং শক্তিকে প্রয়োগ করা তার পক্ষে সম্ভব

হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহের আলোচনা করা হল।

ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তার :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের অভিভাবকে পরিণত হয়েছিল। গ্রেট ব্রিতেন ও ফ্রান্স হিনবল হওয়ার ফলে ইউরোপে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করাই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিধস্ত ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পক্ষে ইউরোপের নতৃত্ব গ্রহণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে পুনরুজ্জীবনের জন্য মার্শাল পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক ঋণ ও সাহায্যের কর্মসূচীর মাধ্যমে ইউরোপকে অর্থনৈতিক দিক থেকে তার নিজের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছিল অন্যদিকে সামরিক জোট গঠন করে, ঘাঁটি স্থাপন ও রণসম্ভারে নিজেকে ও জোটের অংশীদারদের সজ্জিত করার নীতি গ্রহণ করেছিল।

অস্ত্রসজ্জা :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনিতির সঙ্গে তার সমর প্রস্তিতি বা অস্ত্রসজ্জা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । তথ্যগত দিক থেকে দ্বিতীয় বীশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার তিনটি দিক রয়েছে সামরিক জোট গঠন ও সাহায্যের আঞ্চলিক বন্দোবস্ত এবং সর্বশেষে সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির নীতি । সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য সামরিক জোট গঠনের দিকে অত্যাধিক মনোনিবেশ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র নিজে কেবল সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়নি, জৌটভুক্ত এবং পৃষ্ঠপোষিত সকল রাষ্ট্রকে বিপুল সামরিক সাহায্য করেছে।

বিদেশে হস্তক্ষেপ :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে নিজের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণকে অন্য রাষ্ট্রের ওপর চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। দক্ষিন আমেরিকায় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও চিলি, মধ্য আমেরিকায় কিউবা ও অন্যান্য ক্যারিবিয়ান দ্বীপ, জামাইকা, প্রভৃতি দেশেদর ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিরমা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

১৯৬১ সালে কিউবা, ১৯৬৫ সালে ডোমেনিকান রিপাবলিকের দেশদ্রোহীদের ঘাঁটি হিসেবে হন্ডুরস সহ অন্যান্য রাষ্ট্রকে ব্যবহার করেছে।

বর্ণনবিদ্বেষ :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে কোন হস্তক্ষেপ করেনি। দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিন রোডেশিয়ার বর্ণ বিদ্বেষী সরকারের দমন পীড়ন মূলক নীতিকে সমর্থন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিচ্ছিন্নচতাবাদ এবং জাতীয় ঐক্য বিরোধী সকল উপজাতিয় কোন্দলকে সমর্থন করেছে। মার্কিন বিদেশনীতি সর্বদাই ঔপনিবেশিক নীতি ঘেঁষা। এই কারণেই অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্মিকে মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে পর্তুগালকে মার্কিন সরকার সমর্থন করেছে।

আঞ্চলিক অস্তিতিশীলতা সৃষ্টি :

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য এবং অন্যতম উপাদান হিসেবে অনেকে কিথকেন্দ্রিক এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন।এই প্রসঙ্গে ভারত-পাক সম্পর্খের ক্ষেত্রে মার্কিন সরকারর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মার্কিন সরকার উদার হস্তে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে যা একদিকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে যেমন শক্তিশালী করেছে অন্যদিকে তেমনি ভারতের মনে আশা-আকাঙ্খার সৃষ্টি করেছে। এর মানে পাক - ভারতকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশে উত্তএজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতির আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি দেশের সঙ্গে সম্পর্কের প্রকৃতি আলোচনা করা হল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্য প্রাচ্য :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগ গত প্রেক্ষাপটের বিচারে মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা ষম্ভব নয়। মধ্যপ্রাচ্য বলতে সাধারণভাবে মিশর, জর্ডন, লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, তুরষ্ক, হিয়েসেন, প্যালেস্তাইন প্রভৃতি অঞ্চলকে বোঝায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক বহুলাংশে খনিজ তেলের স্বার্থের

সাথে জড়িত। মধ্যপ্রাচ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জাপানের মোট প্রয়োজনের ৭৫% তেল সরবরাহ করে। আরব রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের স্বার্থে তেলকে কূটনীতির মাধ্যমে রূপে গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও খনিজ তেলের স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্যে নিজের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসারত পাঁচটি মার্কিন সংস্থা খনিজ তেলের সাহায্যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেছে।

টিপ্পনী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকা নীতি :

আফ্রিকার কমিউনিষ্ট প্রভাব প্রতিরোধ, অর্থনৈতিক স্বার্ধের প্রসার, শ্বেতাঙ্গদের রাজনৈতিক প্রাধান্য সংরক্ষণ, জাতির মুক্তি আন্দলনের বিরোধীতা, আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের জাতিয় ঐক্যের বিরোধীতা, রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য ঔপনিবেশিক ও বর্ণবিদ্বেষী সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকা নীতির মূল ভিত্তি।

আফ্রিকা সম্পর্কে মার্কিন নীতি সাম্রাজ্যবাদ এবষং ঔপনিবেশিক শোষণের অনুকূলে ছিল। ঔপনিবেশিক শক্তির সাহায্য ছাড়া আফ্রিকার অধিবাসীদের নিজেদের চেষ্টায় কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব নয় - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধারনার ভিত্তিতেই আফ্রিকা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করেছে। একদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি সমর্থন এবং অন্যদিকে উপনিবেশিকতা বিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর বিরোধী দুটি নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছে।

রুশ - মার্কিন সম্পর্ক :

মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পুঁজিবাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কোনো সময়েই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্বাঙ্গে ক্ষমতার আসলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন আলোচনা করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। অনুষ্ঠিত বৈঠকে অস্ত্র নীয়ন্ত্রণসংক্রান্ত বড় কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলেও দুই নেতার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তিকালে মার্কিন ও সোভিয়েত প্রশাসনে পরিবর্তন আসে, বুমা এবং পুতিনের সম্পর্ক মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নতুন দিশার সন্ধান দেয়।

টিপ্পনী

ভারত মার্কিন সম্পর্ক :

ভারত দক্ষিন এশিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র। জনসংখ্যা, ভূখন্ডের পরিমাণ, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, সামরিক ক্ষমতা, প্রযুক্তির বিকাশ ইত্যাদি দিক থেকে বিচার করলে ভারতকে এশিয়ার মহাশক্তিধর দেশ রূপে বিচার করলে অত্যুক্তি করা হয় না। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল বিশ্বের অন্যতম মহাশক্তিধর দেশ। ভূ-রাজনীতির বিচারে ভারত এমন এক স্থান অধিকার করে আছে, যা তাকে মার্কিন প্রশাসনের আকর্ষনের কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

১৯৪৭ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারত -মার্কিন সম্পর্ক কোন সরলরেখা ধরে অগ্রসর হয়নি। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত উভয় দেশ পরস্পরকে ভালোভাবে অবহিত করার চেষ্টা করেছে। এই সময় কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারত -মার্কিন মতান্তর বা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মার্কিন সামরিক ঘাটি স্থাপন উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। ১৯৫০ - ৫২ সালের মধ্যে উভয় দেশ পরস্পর থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কারন, চীন- ভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক আর কোরিয়ার যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা। ১৯৫৩ - ৬০ সালের মধ্যে ভারত - মার্কিন সম্পর্কের অবনতির প্রধান কারণ ছিল। পাকিস্তানের প্রতি মার্খিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ সমর্থন। ১৯৬২ সালে ভারত - চীন সীমান্ত সংঘর্ষ। ১৯৬৫ সালের ভারত - পাক যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ফলে সকল মার্কিন সাহায্য বন্ধ প্রভৃতি মার্কিন সরকারকে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলনতে সাহায্য করে।

সম্প্রতি অরুনাচল সীমান্তে ডোকলাম সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারত চীনের বিরোধে ভারত বরাবর মার্কিন সমর্থন পেয়ে এসেছে।আবার ভারতে পাকিস্তানী জঙ্গি গোষ্ঠীর ক্রমাগত হানার তিব্র প্রতিবাদ করে মার্কিন সরকার ভারতের পাশে দাড়িয়েছে।

প্রজাতন্ত্রি চীনের বিদেশনীতি :

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন হল আধুনিক বীশ্বের অন্যতম প্রাচীন শক্তি। হাজার আজার বছরের উত্থান পতনের ইতিহাসেদর মধ্যে দয়ে বিশ্বের এই প্রাচীন সভ্যতার উন্নেষ ঘটেছে। অনেক পট পরিবর্তনের পর চীন এক সমৃদ্ধ সভ্যতা ও জীবনের অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দিতে এই দেশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শষোষনের অভিজ্ঞতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। বহু এবং দীর্ঘস্থায়ি আপসহীন সংগ্রাম এবং

রক্তপাতের মাধ্যমে ১৯৪৯ সালের ১ লা অক্টোবর চীন প্রকৃত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন এবং দেশের আভ্যন্তরীন শোষনবাদের হাত থেকে কোটি কোটি মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছে।

চীনের স্থলসিমায় আয়তন ২০,০০০ কিলোমিটারের বেশী। চীনের পূর্বদিকে কোরিয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, উত্তরে মাঙ্গোলিয়া, উত্তর পশ্চিমে আছে তাজাকিস্থান, কিরঘিজিস্থান এবং কাজকাস্থান। পশ্চিমে আছে পাকিস্তান ও আফগানিস্থান। দক্ষিনে নেপাল, ভারত, ভূটান, মায়নমার, এবং ভিয়েতনাম। প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল ওটরেখা জলপথে বহির্বিশ্বের সাথে চীনের যোগাযোগ সৃষ্টি করেছে। পূর্বদিকে চীন সাগ, দক্ষিন-পূর্ব দিকে দক্ষিন চীন সাগরের অন্যদিকে অবস্থিত জাপান, মালোয়েশীয়া, ইন্দোনেশিয়া। সুতরাং ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে বিচার করলে চীনের পররাষ্ট্রনীতিতে ভৌগলিক উপাদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

টিপ্পনী

চীনের পররাষ্ট্র নীতি প্রনয়নের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা :

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মূল সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতি প্রনয়নের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। তবে জাতীয় গণ কংগ্রেসই ছিল আইন প্রনয়নের প্রধান কেন্দ্র, এই সংস্থাটিই হল রাষ্ট্রিয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ্ কেন্দ্র। এই কারণে পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে ও চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করে এই সংস্থা। কিন্তু গণ কংগ্রেসের অধিবেশন বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়। যদিও বিশেষ অধিবেশন আহ্বনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু প্রায় ৩০০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি আইনসভার পক্ষে দীর্ঘ আলোচনার পর কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া অত্যন্ত কষ্ঠসাধ্য।

প্রকৃতপক্ষে জাতিয় গণ কংগ্রেসের দায়িত্ব বহন করে স্থায়ী কমিটি। এই কমিটি। এই কমিটিতে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃস্থানীব ব্যক্তিরা থাকেন। জাতিয় গণ কংগ্রেসের দুটি আধিবেশনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এই স্থায়ী কমিটিই জাতিয় কংগ্রেসের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে। জাতিয় কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটিকে অন্য রাষ্ট্রে চীনের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিয়োগ এবং প্রত্যাহার করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সন্ধি ও চুক্তিকে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা নভাস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রিয় পরিষদকে পররাষ্ট্র বিষয়ক পরিচালনা এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি

ও চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

চীনের বিদেশনীতির মৌল বৈশিষ্ট্য :

চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রতি অঙ্গীকার বদ্ধ চীনেদর পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক নির্দেশিকা হল : তৃতীয় বিশ্ব এবং সকল শান্তীকামী দেশেদর সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করা।

টিপ্পনী

স্বাধীনতা ও নির্ভরশিলতা চীনের বিদেশ নীতির অন্যতম লক্ষ্য কোন দেশই চীনকে তার করদ রাজ্যে পরিণত করতে পারবে না। কোন দেশ ততার নিজের স্বার্থে চীনকে কোন কিছু করাতে বাধ্য করতে পারবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ৩০ বছর ধরে কোরিয়া ও ভিয়েতনামের রণক্ষেত্র এবং কূটনীতির ক্ষেত্রে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে চীনকে অন্য সব রাষ্ট্রের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছে।

চীনের বিদেশ নীতির মূলক বক্তব্য হল, চীন পারস্পরিক সাবর্বভৌমত্ব এবং ভূখন্ডগত অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনাগ্রাসন, অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত ধাকা, সমতা এবং পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা ও শান্তিপূর্ণ হাবস্থান। স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, চীন কখনও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা বা মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জনের চেষ্টা করবে না।

চীনা নেতৃবৃন্দের তিন বীশ্বের তত্ত্বানুসারে চীন বীশ্বব্যাপী সকল প্রলেতারিয়েত, নির্যাতিত জনগণ, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ তৃতীয় বীশ্বের জাতিসমূহের ঐক্যবিধানের নীতি অনুসরণ করবে। আগ্রাসন, নাশকতামুলক ক্রিয়াকলাপ, অবৈধ হস্তক্ষেপ, সামাজিক সাম্রাজ্যমূলক ক্রিয়াকলাপ, অবৈধ হস্তক্ষেপ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী মহাশক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে চীন ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ হবে। মআশক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের চক্রান্তের দ্বারা আক্রান্ত দেশ সমূহের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যপক আন্তর্জাতিক মোর্চা গঠন মানবজাতির প্রগতি এবং মুক্তিকে চীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ভিত্তিগত নীতিরূপে গ্রহণ করেছিল।

চীন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে বিশ্বাসী। পারস্পরিক আলাপ আলোচনা এবং শির্ষ বৈঠকের মাধ্যমে চিন বিরোধের নিষ্পত্তিতে আস্থাশীল।

সাম্প্রতিককালে চীন ভারত শীর্ষ বৈঠক ভারতের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত বিরোধের মীমাংসার আগ্রহ সেই আস্থাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। চীন, নেপাল, মাঙ্গোলিয়া, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন জাতিয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার শোষিত জাতি সমূহের প্রতি তার দ্বিধাহীন সমর্থন স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চীন কোরিয়া ও ভিয়েতনামের জনগণের সংগ্রামের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন এবং সাহায্যের হাত প্রসারিত করেএ। দক্ষিন আফ্রিকা সরকারের বর্ণ-বিদ্বেষী নীতি, নামিবিয়ায় তার অবৈধ দখলদারী, আরব রাষ্ট্রসমূহের উপর ইজরায়েলের আগ্রাসনের তীব্র বিরোধীতা করেছে। নয়া-ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার দেশ সমূহের প্রতি ও চীনের সমর্থন ছিল দ্বিধাহীন এবং বলিষ্ঠ।

টিপ্পনী

প্রশ্নাবলী :

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১. বিদেশনীতি কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর?

২. জাতিয় স্বার্থ - কথাটির অর্থ আলোচনা কর।

৩. কূটনীতি ও বিদেশনীতির কী সম্পর্ক?

৪. জাতিয় সুরক্ষা পরিষদ এর কাজ কী?

৫. সামরিক জোট কেন গড়ে ওঠে?

৬. 'পঞ্চশীল' কী? এর তাৎপর্য ব্যখ্যা কর।

৭. কাশ্মীর সমস্যার উৎপত্তই হল কীভাবে?

৮. সীমান্ত সমস্যার সমাধানে চীন ভারত কী পদক্ষেপ নিয়েছে।

৯. কিউবা সংকট কী?

রনাধর্মী প্রশ্নাবলী :

১. কূটনীতি কাকে বলে? কূটনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২. প্রচারণাকী? এর পদ্ধতিগুলি ও কার্যকারিতা আলোচনা কর।

৩. ভারতের বিদেশনীতি প্রণয়নে বিভিন্ন নির্ধারকের ভূমিকা লেখ।

৪. বিপ্লোত্তর চিনের বিদেশনীতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

৫. ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রেক্ষিতে সোভিয়েত - মার্কিন সম্পর্কটির বিশ্লেষণ কর।

৬. গ্রেট ব্রিটেনের বিদেশনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

গ্রন্থপঞ্জী :

টিপ্পনী

১. রাধারমন চক্রবর্তী, সুকল্পা চক্রবর্তী - সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা - ২০০৯

২. নির্মলকান্তি ঘোষ, পিতম ঘোষ, - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, শ্রীভূমি পাবলিশিং, কলকাতা - ২০০৪

৩. শক্তি মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংগঠন ও পররাষ্ট্র নীতি, ওয়ার্ল্ড প্রেস, কলকাতা - ২০০০

৪. অনীক চট্টোপাধ্যায় - ঠান্ডা যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০১২

৫. গৌতম কুমার বসু - সমসাময়িক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০১২

৬. প্রাণগোবিন্দ দাশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা) লিমিটেড, কলকাতা - ২০১১

৭. গৌরিপদ ভট্টাচার্য - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০০৪

৮. আরূপ সেন - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব ও তথ্য, নবোদয় পাবলিকেশনস, কলকাতা - ২০১২

৯. ড. অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সেন্ট্রাল পাবলিশিং, কলকাতা - ২০০৪

১০. অঞ্জনা ঘোষ - ঠান্ডাযুদ্ধ উত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংকট ও প্রবণতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ,কলকাতা - ২০০৭

১১. বানীপদ সেন - সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়, বিন্যাস ও ব্যাখ্যা ; বিক্রম প্রকাশক ২০১০

টিপ্পনী

টিপ্পনী

একক -৩ : নয়া উপনিবেশবাদ

ঠান্ডাযুদ্ধের আন্তর্জাতিক রাজনীতি :

টিপ্পনী

ঠান্ডাযুদ্ধের অবসানের পর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কতগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যেমন - ঠান্ডাযুদ্ধের পর বিশ্বের দ্বিমেরুভিত্তিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে এবং পূরাতন সোভিয়ের রাশিয়ার বিভাজনের ফলে রাশিয়ার শক্তি ও মর্যাদা অনেক কমে গেছে। যার ফলে অনেকে এই ব্যবস্থাকে একমেরুভিত্তিক বলে বর্ননা করেছেন । বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে । তবে অনেকে এই মতবাদের বিরোধীতা করে বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বহুমেরুভিত্তিক বলে বর্ণনা করেছেন । তাদের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অতি বৃহৎ শক্তি না হলে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে বৃহত্তম শক্তি বলে বর্ণনা করাই সঙ্গত।

ঠান্ডাযুদ্ধের পরবর্তীকালে নতুন আন্তর্জাতিক ব্যববস্থায় বহু আঞ্চলিক জোটের গুরুত্ব প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে । এই প্রসঙ্গে NATO জোটের প্রসারন, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের বিস্তৃত কার্য দ্বারা এশিয়ানের কার্যসূচী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ঠান্ডাযুদ্ধের পর বিশ্বের ধনী দেশগুলি একটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগের আশঙ্কা দূর করেছে।

ঠান্ডাযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে রাষ্ট্রগুলি তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রাষ্ট্রগুলি আনুগত্য লাভের জন্য বিশেষ আগ্রহী নয় । তবে সমসাময়িক কালে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে ভারতসহ অনেক তৃতীয় বিশ্বের দেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে।

১৯৯০ এর দশকে উদারনৈতিক ধনতন্ত্রের প্রভাব বিশেষ ভবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধনতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রথম বিশ্বের দেশগুলি না

উপনিবেশবাদের কলাকৌশল তৈরী করেছে।

নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় জোট নিরপেক্ষতার কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই বলে অণেকে মনে করেন। অনেকের ম তে আজ পৃথিবীতে দ্বিতিয় বিশ্ব বলে কিছু নেই এবং সেই কারণে তৃতীয় বিশ্ব কথাটির প্রাসঙ্গিকতা নেই।

টিপ্পনী

পৃথিবীর ধনী দেশগুলির সঙ্গে দরিদ্র ও দূর্বল দেশগুলির শক্তিগত পার্থক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকের মতে নতুন বিশ্বব্যবস্থায় দরিদ্র দেশগুলির প্রভাব খর্ব হয়েছে।

ঠান্ডাযুদ্ধ অবসানের পর অনেকের মতে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ঠান্ডাযুদ্ধের পরিবর্তে অর্থনেতিক ঠান্ডা যুদ্ধচেদর শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বকে বহুকেন্দ্রীক বলে বর্ননা করা হয়।

আবার এই নতুন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার রক্ষা প্রশ্নের মুখে দাড় করিয়েছে। ধর্মীয় বাদ, সন্ত্রাসবাদ, অর্থনৈতিক সমস্যা, ইত্যাদি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মানবধিকার খর্ব হচ্ছে প্রতি পদে পদে।

নয়া উপনিবেশবাদ :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালকে সম্রাজ্যবাদের পতনের যুগ বলা হয়। এই সময় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার পরাধীন দেশগুলি একে একে সাম্রাজ্যবাদী শাসন - শোষনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে এবং স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকে। তবে সাবকি সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নিলেও নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই এই নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদে পত্তন হতে থাকে দ্বিতিয় বীশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। এই নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিভাষায় নয়া উপনিবেশবাদ আখ্যা দেওয়া হয়। বাস্তবিক পক্ষে দ্বিতীয় বীশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বহু পরাধীন দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে পরাধীন থেকেই যায়। এই পরিস্থিতিকেই বলা হয় নয়া উপনিবেশবাদ। ঘানার প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান কে. নক্রুমা (K. Nkhrma) তাঁর "Neo colonialism the last state of Imperialism" গ্রন্থে মন্তব্য করেন, 'নয়া উপনিবেশবাদের মর্মবস্তু হল এই যে যেসব রাষ্ট্র নয়া উপনিবেশবাদের নাগপাশে আবদ্ধ রয়েছে তারা তত্ত্বগতভাবে স্বাধীন এবং

সার্বভৌম রাষ্ট্র, কিন্তু বাস্তবে তারা স্বাধীন নয়, কারণ তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক নীতি বাইরের থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ব্রুটেন্টস বলেছেন, নয়া উপনিবেশিক ব্যবস্থায় পরস্পরাশয় উপনিবেশগুলির অস্তিত্ব নেই ঠিকই, কিন্তু শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ কতৃক দুর্বল দেশগুলিকে শোষন ও নিয়ন্ত্রণ আগের মতোই অপরিবর্তিত থেকে গেল। এই যুগে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রন রাজনৈতিক শাসনের চেয়ে অর্থনৈতিক আধিপত্যেদর উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল। নরমান লে (Norman Lowe) তাঁর Mastering Modern world history গ্রন্থে বলেছেন প্রাপ্ত স্বাধীনতা প্রাপ্ত নতুন দেশগুলি এখনও পর্যন্ত বাজার ও বিনিয়োগের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল ; আপর এই নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে উন্নত দেশগুলি দুর্বল দেশগুলির উপর সে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে সেটাই হল নয়া উপনিবেশবাদ। ব্রায়ান ক্রজিয়ের বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাষদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করলেও তারা সামরিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক এই তিনটির সমন্বয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে চলেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে পুরনো ধাঁচের ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে আর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে শাসন ও শোষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তারা নতুন কৌশল ও পদ্ধতির মাধ্যমে শোষন ও শাসন বজায় রেখে চলেছে। এই প্রসঙ্গে মিশরের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ত্রাসের বলেছেন, নয়া উপনিবেশ বাদ হল এক ধরনের আবরণ যার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অন্যান্য দেশের সম্পদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে এবং তাদের সর্বস্বান্ত করতে চায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্তমান দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের আকার প্রকার বদলেছে, কিন্তু এর অবসান ঘটেনি অদূর ভবিষ্যতে সে ধরনের কোনো সম্ভবনা নেই। এই প্রসঙ্গে পামার ও পারকিনস মন্তব্য করেছে, উপনিবেশবাদ বিদায় খোলাখুলি বা অনাবৃত্তভাবে তাদের শাসন কায়েম না করেও অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সুচতুরভাবে তারা তাদের শাসন শোষণ এবং স্বার্থ লোকচক্ষুর অন্তরালে বজায় রেখে চলেছে, আর একেই বলা হয় নয়া উপনিবেশবাদ।

নয়া-উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য :

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নয়া উপনিবেশবাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(১) নয়া উপনিবেশবাদ হল সাম্রাজ্যবাদি শোষনের নতুন রূপ।

(২) নয়া উপনিবেশবাদের প্রধান লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক শোষণ।

(৩) নয়া উপনিবেশবাদের শোষনের রূপটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অবগুন্ঠিত।

(৪) নয়া উপনিবেশবাদের উদ্ভব দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধোত্ত্রকালে ওই সময় একদিকে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে ধাকে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদি শক্তিগুলি নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে অর্থনৈতিক শোষন বজায় রাখতে থাকে।

(৫) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পারিক নির্ভরশীলতা মত বৃদ্ধি পেয়েছে। নয়া উপনিবেশবাদ তত সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

(৬) কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে নয়া উপনিবেশবাদ শুধু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির একচেটিয়া ব্যাপার নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুওলি ও নয়া উপনিবেশবাদের কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

নয়া উপনিবেশবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল :

যে সমস্ত পদ্ধতি বা কৌশলের সাহায্যে নয়া উপনিবেশবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে শোষন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, সেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল :

(ক) আর্থিক সাহায্যে ও ঋণপত্র :

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কতৃক দেশগুলি কতৃক তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার অন্যতম হাতিয়ার হল অর্থনৈতিক সাআয্যে ও ঋণদান। তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল দেশগুলি তাদের দারিদ্র্য মোচনের জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছ থেকে ঋণ ওনানা প্রকার আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য নেব।তবে এই সাহায্যে দেওয়ার সময় নানা ধরনের প্রতিকূল শর্ত জুড়ে দেয়। যেমন - শিল্প, বানিজ্যের বেসরকারি করণ, বিদেশি পুঁজির অবাধ প্রবেশ, ঋনদানকারী দেশ থেকে চড়া দামে যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি। অনেক সময় প্রকল্প ভিত্তিক বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যে প্রদান করা হয়। এসব ক্ষেত্রে বলা হয় প্রকল্প নির্মাণ করতে যে সন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে তা সাহায্যদানকারী দেশ থেকে কিনতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উৎপাদিত দ্রব্য কম

দামে সাহায্যেদানকারী দেশের কাছে বিক্রয় করতে হবে। এইভাবে ঋণদানকারী দেশগুলি দরিদ্র দেশগুলির আমদানি রপ্তানি ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো ও পরিকল্পনা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সাবেকি মহাবন্দী কায়দায় তাদেরকে ঋনের জালে আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে ফেলে। এইভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ধণী দেশগুলির উপর ক্রমশই নির্ভরশিল হয়ে পড়ে। বৈদেশিক সাহায্যে ও ঋণদানের কৌশল প্রয়োগ করে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দুর্বল রাষ্ত্রগুলিকে কার্যত অর্থনৈতিক অধীন দেশএ পরিণত করে।

টিপ্পনী

(খ) বহুজাতিক সংস্থা :

নয়া উপনিবেশবাদের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল বহুজাতিক সংস্থা। বহুজাতিক সংস্থাগুলি পৃথিবীর বহুষদেশে ব্যবসা-বানীজ্য চালায় এবং ওইসব দেশের আর্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম জেনারেল মোটরস, আই. বি. এম, জেনারেল ইলেকট্রিক, জি. এস. টি প্রভৃতি বিশাল আকারের বহুজাতিক সংস্থাগুলিরকাজকর্ম বিশ্বেদর নানা দেশে বিস্তৃত। এরা বিভিন্ন দেশে নিজেদের কোম্পানী গড়ে তোলে ল এদের মূল লক্ষ্য হল বিশ্বের বাজার দখল করা এবং সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করা। জাতিপুঞ্জের একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, বর্তমান বিশ্বে শ-তিনেক বহুজাতিক সংস্থা ৮০ শতাংশের উপর বিশ্ববাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের লগ্নি পুঁজির মুনাফা অর্জন করে, অন্যদিকে তেমনি বিদেশের সরকার গুলির উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কখনও কখনও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশ এই শাসন ও শোষণের থেকে বাইরে থাকতে পারেনি।

(গ) বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ :

নয়া উপনিবেশবাদের একটি অতন্ত কার্যকর কৌশল হল বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয় বীশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ রাজনতিক স্বাধীনতা অর্জণ করেছে। কিন্তু ওইসব দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য এখনও ঔপনিবেশিক দেশগুলির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে ওইসব দেশের কাঁচা মাল, খনিজ সম্পদ এবং উৎপাদিত পণ্যের দাম কী হবে তা স্থির করে দেয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বের দরিদ্রদেশ গুলি তাদের জিনিসপত্রের

টিপ্পনী

ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশই দুর্বল হতে থাকে। অনেক সময় এই অসম বানীজ্যিক বিনিময় ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, আনবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তিতে ভারত স্বাক্ষর না করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন পুনবিবেচনার হুমকি দিয়েছিল।

(ঘ) সামরিক জোট গঠন :

নয়া ঔপনিবেশিক শক্তি গুলি অনেক সময় সামরিক জোট গঠন করে বা সামরিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করর চেষ্টা করে। দ্বিতীয় বীশ্বযুদ্ধের কালে সাম্যবাদের প্রসাররোধ কল্পেমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি সামরিক জোট গঠন করা হয়, যথা- ন্যাটো, সেন্টো, সিমাটো ইত্যাদি ল ওইসব সামরিক জোট কেবলমাত্র সাম্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ছিল ছিল তা নয়, ঐ গুলিকে উপনিবেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকেও ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করা হত। উদাহরণ স্বরুপ আলিজিরিয়ার যুক্তি আন্দোলন দমনের জন্য ফ্রান্স ন্যাটোকে কাজে লাগিয়েছিল। এছাড়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে নানা সামরিক জোট ও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সামরিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কর হয়।

(ঙ) সামরিক ঘাঁটি স্থাপন :

তৃতীব বিশ্বের দুর্বল দেশগুলিকে নিবন্ত্রণে রাখার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন স্থানে সমারিক ঘাঁটি স্থাপন। সামরিক ঘাঁটি সস্থাপনের উদ্দেশ্য হল পাশ্ববর্তী দেশগুলিকে আক্রমণ অথবা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বনিয়ন্ত্রণে রাখা। তাইওয়ান, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর এবং ভারত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত ভিয়াগো গার্সিয়াম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমারিক ঘাঁটি নির্মান করেছিল এবং পাশ্ববর্তী দেশগুলির উপর তার আধিপত্য বিস্তারে সক্রিয় থেকেছিল। এই প্রসঙ্গে মেলকোত ও রাও বলেন, এশিয়াচর সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জলপথের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেইসব দেশের উপর চূড়ান্ত আধিপত্য বিস্তার করতে পারে সেসব রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অস্তিত্ব জলপথে আমদানির উপর নির্ভরশীল।

(চ) বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতি :

নয়া উপনিবেশবাদের অন্যতম অণুসঙ্গ হল বিশ্বায়ন তথা বাজার অর্থনীতি। বিশ্বাসন হল বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের বিস্তার ; দেশের বাজার ও বিশ্ববাজারেরমধ্যে কোনো বেড়া না থাকা এক দেশ থেকে অন্য দেশে দ্রব্য সেবা, পুঁজি, প্রযুক্তি প্রভৃতি আদান প্রদানের কোনো বাধানিষেধ না ধাকা। এছাড়া অথনীতির প্রশ্নে রাষ্ট্রের নীরব থাকা, দেশীয় অথনীতিতে বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত করে দেওবা, ব্যাপকভাবে আমদানি উদারীকরণ নীতি অণুসরণ ইতভাদি ্ল বিশহবোআয়নের দর্শন। যেসব কার্যপদ্ধতির উপর বিশহবায়নেদর প্রক্রীয়াটি দাঁড়ীয়ে থাকে সেগুলি বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ, বহুজাগতিক সংস্থাগুলির বিশ্বজোড়া কর্মকান্ড, উৎপাদন ও বিনিয়োগের আন্তর্জাতিকীকরণ। আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার নির্দেশিত কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কার্যক্রম বলপূর্বক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ভারসাম্যমূলক বাজেট প্রবর্তন, বীশ্ববাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক প্রযুক্ত পক্ষপাতমূলক বানীজ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এগুলি সবই পুঁজিবাদী দেশগুলিকে শক্তিশালী করেছে এবং তৃতিয় বিশ্বের দুর্বল দেশগুলির পর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে পিটার মার্কার বলেছেন, বিশ্বায়ন নতুন কিছু ব্যাপার নয়। এটা হল এক বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদী বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিস্তার।

(ছ) পুতুনা সরকার গঠন :

নয়া উপনিবেশবাদের একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল হল অন্য রাষ্ট্রে পুতুনা সরকার বা তাঁবেদার সরকার স্থাপন করা। এই ধরনের সরকার গুলি নিজ দেশের জনগণের পরিবর্তে বৃহৎ শক্তিগুলির স্পষ্টপূরণে বেশি সক্রিয় ধাকে এইভাবে দক্ষিণকোরিয়া, ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পুতুনা সরকার গঠন করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। এছাড়া সাম্রাজ্যেবাদ বিরোধী রাষ্ট্রগুলিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো, প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটানো নানা নাশকতামূলক কাজে সাহায্যে দান সমারিক হস্তক্ষেপ প্রভৃতির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়।

(জ) পশ্চিমী সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকীকরণ :

নয়া উপনিবেশ বাদেদর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলহল সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

। সামাজচরবাদী দেশগুলি জানে অর্থনৈতিক শোষন বজায় রাখতে গেলে উন্নয়নশিল দেশগুলির জনসাধারণের জীবন ধারাগত বৈশিষ্ট্য, তাদের বেশভূষা, খাদ্যাভাষ, রুচি ইত্যাদি পরিবর্তন করা দরকার। তাই তারা নানভাবে অনুন্নত দেশ গুলির নিজস্ব ঐতিহ্যগত সংস্থৃতি বিনষ্ট করে তার জায়গায় পশ্চিমী সাংস্থৃতিক বিশ্ববভাপী প্রসার ঘটাতে চায়; তারা ওইসব দেশের মানুষের বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, বেতার, দূরদর্শণ, চলচিত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলিকে কাজে লাগিয়ে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার গতিরোধ করে এবং বিদেশি-সংস্কৃতি অন্ধ অনুকরণে মানুষকে উৎসাহ দেয়। গায়ে জিন্সের জামা, প্যান্ট, হাতে কোল্ড ড্রিংক্সের বোতল, কানে মোবাইল, মুখে ফাস্ত-ফুড এখন পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলের মানুষেরক্ষেত্রে একটা সাধারণ ব্যাপার। বলাবাহুল্য এগুলি সবই সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিকেই শক্তিশালী করে চলেছে।

(ঝ) অন্যান্য কৌশল :

উপরিউক্ত কৌশল গুলি ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নয়া উপনিবেশবাদকে জিউয়ে রাখতে আরও নানা ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেয়। উদাহরণ স্বরূপ অন্য দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে মদত দেওয়া উগ্রপন্থীদের সাহায্যে ও প্রশিক্ষন দিয়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করা ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া উপজাতিয় সংঘর্ষে প্ররোচনা দেওয়া ইত্যাদি হল নয়া উপনিবেশবাদের অপরাপর কৌশল।

নয়া উপনিবেশবাদের কুফল :

নিম্নে নয়া উপনিবেশবাদের কুফলগুলি আলোচনা করা হল :-

(১) নয়া উপনিবেশবাদের ফলে পৃথিবীর সদ্যস্বাধীন দেশগুলির অর্থনীতি শিল্পন্নত দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই পর নির্ভরশীলতা অনুন্নত দেশগুলির শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে।

(২) অনুন্নত দেশগুলি যত বেশি দুর্বল ও নির্ভরশিল থাকবে, দেশগুলির পক্ষে তত বেশি অর্থনৈতিক শোষন ও আধিপত্য বিস্তারের কাজটি সহজ হবে। তাই নয়া উপনিবেশ শক্তিগুলি ষড়যন্ত্র করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে রাজনৈতিক অস্তিরতা বাড়ায়, বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভেদগামী শক্তিগুলিকে ইন্ধন জোগায়, উপজাতিয় সংঘর্ষে

প্ররোচনা দেয়।

(৩) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে দুর্বল রাখার আর একটি উপায় হল এই দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া অথবা যুদ্ধের পরিস্থিতি জিইয়ে রাখা। বলাবাহুল্য এ ব্যাপারেও ঔপনিবেশিক শক্তি পিছিয়ে নেই। এতে তাদের দুইদিক থেকে একদিকে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয় করে মুনাফার পাহাড় তৈরি করা যাবে এবং অন্যদিকে দরিদ্র দেশগুলির অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কাজটি সহজ হবে।

(৪) নয়া উপনিবেশবাদ শক্তিগুলি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে তার ফলে সামরিক উত্তেজনা, উদ্বেগ ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৫) নয়া উপনিবেশবাদের অশুভ প্রভাব থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও রেহাই পায়নি। বস্তুত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বর্তমানে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। জাতিপুঞ্জের এই অসহায় অবস্থা প্রকট হয়ে ওঠে গত শকতকের নব্বই এর দশকে অনুষ্ঠিত উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের দুর্বল ও উন্নয়নশিল রাষ্ট্রগুলির উচিত নিজেদের মধ্যে বিভেদও অনৈক্য ভুলে গিয়ে যৌথভবে নয়া উপনিবেশিকতার অবসানে সক্রিয় হয়ে ওঠা।

তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সেসব নতুন ধারণা আত্মপ্রকাশ করেছে তার মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব এর ধারনা অণ্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার যেসব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেইসব দেশকে বলা হব তৃতীয় বিশ্বের দেশ। প্রকৃত পক্ষে ৬০ এর দশক থেকেই তৃতীয় বিশ্বের ধারনা অতিদ্রুত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

তৃতিয় বিশ্বের দেশগুলি উৎপত্তির দিন থেকেই সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানা সমস্যায় জর্জরিত নিম্নে সেইসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হল।

(ক) সামাজিক সমস্যা :

(১) দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকার জন্য তৃতিয় বিশ্বের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দেশগুলিতে সুষ্ঠ সমাজ সংগঠিত হতে পারেনি। ঔপনিবেশিক শাসকগণ নিজেদের স্বার্থে এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে উপনিবেশগুলিতে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছে। জাতি, উপজাতি, ধর্ম, বর্ণ, ইত্যাদির ভিত্তইতে উপনিবেশের জনগণকে বিভক্ত করেছে। ভারতে হিন্দু মুসলমান বিরোধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদপন্থী আন্দোলন। লেবাননে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের বিরোধ ইত্যাদি ঔপনিবেশিক শাসনে্ উত্তরাধিকার।

(২) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। উপনিবেশিক শাসনে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলনা। ঔপনিবেশিক শাসক নিজেদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যাক্তিকে শিক্ষিত করে তুলেছিল। সামান্য কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় শহরাঞ্চলে। গ্রামঞ্চলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে এ ব্যাপারে শুধু ঔপনিবেশিক শাসকের উপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। স্বাধীনতা লাভের পরও এ ব্যাপারে তেমন একটা উদ্যোগ নেওয়া হবনি। ভারতের কথাই বলা থাক। ভারতের জনসাধারণের চল্লিশ শতাংশ মানুষ এখনও নিরক্ষর। আর এই শিক্ষার অভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুওলিতে সুসংগঠিত সচেতন সমাজ গড়ে ওঠেনি।

(৩) তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি। আর এই মাত্রাধিতিরিক্ত জনসংখ্যা আরো অনেক সসমস্যা তৈরি করেছ। যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যাভাব, বেকারত্ব, অপুষ্টি ইত্যাদি সৃষ্টি কচরেছে।আবার খাদ্যাভাব বা বেকারত্বের ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা, যেমন আইন শৃঙ্খলার অভাব, সাম্প্রদাবিক সংঘর্ষ, চুরি, ছিনতাই, শিশু ও নারী নির্যাতন ইত্যাদি। অশিক্ষা ও দারিদ্রের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনসংখ্যা হ্রাস কর্মসূচীগুলি সফল হয় না। অবশ্য বর্তমান সময় পরিকল্পনার তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে সক্ষম হয়েছে।

(খ) রাজনৈতিক সমস্যা :

(১) তৃতিয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ দীর্ঘ দিন ঔপনিবেশিক শাসনেদর অধীনে থাকার জন্য এই সব দেশে উন্নত রাজনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেনি। রাজনৈতিক পরিকাঠামো বলতে সেই সব অত্যাবশ্যকীয় পরিকাঠামোকে বোঝায় সেগুলি সুষ্ঠুভাবে রাৎত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন, যেমন অবাধ নির্বাচন, সংসদীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক

পদ্ধতিতে ক্ষমতা অর্জন শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল বিরোধবী দলের অস্তিত্ব ইত্যাদি। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই হয় একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন অথবা সামরিক শাসন অথবা বিদেশী মদত পুষ্ট গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত জনবিরোধী শাসন দেখা যায়। অবশ্য ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করছে।

টিপ্পনী

(২) দির্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জনসাধারণ জাতি, ধর্ম, বর্ন, ভাষা, সংস্খৃতি, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি দিক থেকে বিভক্ত ছিল। বলা বাহুল্য বিদেশি শাসকগণ এই ধরনের বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি উন্নয়নশিল দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা, উত্তেজনা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য বিভেদপন্থী শক্তিকে মদত দিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন, লেবানন, নামিবিয়া, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশে তারা এই প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

(৩) প্রাক্তন তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির মানুষদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। তাদের নেতৃত্বেই স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই শ্রেনীর হাএই দেশের শাসন ভার অর্পিত হয়। দুঃখের বিষয় এই শাসকগোষ্ঠী জাতির কথা না ভেবে নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণিগত স্বার্থে শাসন কাঠামোর বিন্যাস সাধন করেছে। এরা জাতিগত, ধর্মগত, ভাষাগত বৈষম্য ও বিভাজন দূরীকরণের চেষ্টা করেনি। উপরন্তু ঔপনিবেশিক শাসকদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে সাবেকি ব্যবস্থা ও নীতি বজায় রেখেছে। স্বাভাবিকভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদি কাজকর্ম, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদি এইসব দেশে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৪) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হল আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি, যা সরকারকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আমলা তন্ত্রের প্রাধান্য বেড়েছে, জনসাধারণের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রাজনৈতিক চেতনার অভাব সংগঠিত রাজনৈতিক দলের অভাব, যোগ্য রাজনতিক নেতৃত্বের অভাব ইত্যাদি কারণে। সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের বিচ্ছিন্নতার ফলে যে রাজনৈতিক অস্তিরতা দেখা দিয়েছে তা সমালদেবার জন্য কখনও কখনও সামরিক নেতার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর

টিপ্পনী

করা হয়েছে।

(৫) উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুব উন্নত মানের নয়। দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাবে এইসব দেশে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে ওঠেনি, ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের ইচ্ছা ও জনগনের মধ্যে তীব্র নয়। তাছাড়া এইসব দেশে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে পাওয়ার ব্যাপারে যতখানি আগ্রহী থাকে। বভবস্থার প্রতি তাদের করনীয় কর্তব্য সম্পর্কে ততটাই তারা উদাসীন থাকে। তবে এর ব্যাতিক্রম দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ভারতে শিক্ষার অভাব ধাকলেও আজনৈতিক সচেতনতার অভাব নেই। তবে এটা ঠিক এখানকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা ইতিবাচক নয়।

(গ) অর্থনেতিক সমস্যা :

(১) তৃতিয় বিশ্বের উন্নয়নশিল দেশগুলির সবচেয়ে বড়ো সম্যা হল অর্থনৈতিক সমস্যা। দ্বিতীয় বীশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া,আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ দ্রুত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বন্ধন থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরও ওইসব দেশে শিল্প, খনি, প্রযুক্তি ও কৃষিতে বিদেশী পুঁজির প্রভাব অবভাহত থাকে। কৃষির উন্নয়ন, শিল্পায়ন, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে গেলে প্রয়োজন পুঁজি এবং উন্নত দেশগুলির সহযোগিতা। এককথায় উন্নয়নশিল দেশগুলি নিজেদেদর অর্থনীতির বিকাশের জন্য উন্নত দেশগুলির নির্ভরশিল হয়ে পড়েছে। উন্নত দেশগুলিও এই নির্ভরতায় সুযোগ নিয়ে উন্নয়নশিল দেশগুলিকে নানারুপ প্রতিকূল শর্ত মানতে বাধ্য করেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ উন্নত দেশগুলি সে শর্তে ঋণ এবং অর্থনৈতিক সাআয্য দেয়। তা কোনো প্রকারেই উন্নয়নশিল দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের সহায়ক নয়।

(২) তৃতীয় বিশ্বের সদ্যস্বাধীন উন্নয়নশিল রাষ্ট্রগুলিকে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, খাদ্যাভাব প্রভৃতি হাজারো সমস্যা গাড়ে নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা শুরু করতে হয়েছে। ফলে উন্নয়নশিল কর্মসূচি ভীষনভাবে ব্যহত হয়েছে। সামাজিক উন্নয়নের খাতে ব্যায়িত হয়েছে প্রচুর অর্থ। তাই দ্রুত শিল্পায়ন ব্যাহত হয়েছে, কৃষি

উন্নয়নে খুব বেশী নজর দেওয়া সম্ভব হবনি। স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক প্রগতি থমকে গেছে।

(৩) অর্থনৈতিক উন্নয়নেদর একটা প্রয়োজনীয় শর্ত হল স্থিতীশীলতা সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু উন্নয়নশিল দেশগুলিতে এ দুটিরই যথেষ্ট অভাব। আগেই বলা হয়েছে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম, জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনৈক্য ও বিভাজন সুস্থ সমাজন গঠনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক অস্থিরতা আবার রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করেছে এবং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

(৪) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী স্তগিত রেখেও অস্ত্র উৎপাদনকারি দেশ থেকে প্রচুর পরিমান অস্ত্র আমদানি করতে হয়। অস্ত্র উৎপাদনকারী সাম্রাজ্যেবাদী দেশগুলি অস্ত্র রপ্তানির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ভারত, পাকিস্তান, ইরাক, ইরান, মিশর, সৌদি আরব, ইজরায়েল প্রভৃতি দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের নক্কারজনক নীতি অনুসরণ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে তার কাছ থেকে প্রচুর পরিমান অস্ত্র ক্রয় করতে বাধ্য করেছে। ১৯৮৩ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সপ্তম জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে কিউবার প্রধানমন্ত্রীর পেশ করা একটি প্রতিবেদন থেকে জানতে পারা যায় যে ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকর দেশগুলি সামরিক খাতে ব্যায় করেছিল ওইসব দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন মূল্যের ৫.৯ শতাংশ। অথচ জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে ব্যায়ের পরিমান ছিল যথাক্রমে ১% এবং ২.৮%। ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যায় এবং অস্ত্র আমদানি তৃতীয় বিশহবেদর অর্থনৈতিক পঙ্গু করেছে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়িয়েছে। যদিও বর্তমান চিত্রটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার আগে তৃতীব বিশ্বের দেশগুলি যে আশা আকাঙ্খা ও স্বপ্নকে সম্বল করেস্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে ছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর তাদের সকলের সেই আশা বা স্বপ্ন সফল হয়নি। আর এই আশাভঙ্গের মূলে আছে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ঐতিহ্যবাহি কর্তৃত্বকামী

টিপ্পনী

মনোভাব যা নয়া উপনিবেশবাদ হিসাবে কার্যকর রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়। বর্তমানে উপনিবেশবাদ যথারীতি বহাল রয়েছে শুধু বহিরঙ্গটি একটু বদলেছে।

জোটনিরপেক্ষতা:

টিপ্পনী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর ষাট এর দশকের শুরু থেকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জোটনিরপেক্ষতা একটি পরিচিত শব্দে পরিণত হয়েছচে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ভারতের নেহেদু, যুগোশ্লাভার মার্শাল এবং ইজিপেটর নামের এর উদ্যোগে যে জোট নিরপেক্ষতার সূচনা হয়। অচিরেই তা একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। শুরুতে বৃহৎ শক্তিবর্গ জোট নিরপেক্ষতার ওপর তেমন একটা গুরুত্ব আরোপ করেনি। কিন্তু ক্রমশ জোট নিরপেক্ষতা বৃহৎ শক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে।

জোট নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা:

সাধারন ভাবে বলা যায় মার্কিন জোট ও সোভিয়েত জোট কোনো পক্ষেই যোগ না দিয়ে উভয় পক্ষের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল জোট নিরপেক্ষনীতির মূল কথা। বিভিন্ন তাত্ত্বিক এই জোট নিরপেক্ষতার বিভিন্নভাবে মতামত দিয়েছে।

প্রকৃতি:

জোট নিরপেক্ষনীতির অন্যতম প্রধান স্থপিত জওহরলাল নেহেরু জোট নিরপেক্ষতাকে একটি গতিশীল ও ইতিবাচক নীতি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে ইতিবাচক বললে; জোটনিরপেক্ষতা হলো স্বাধীনভাবে কাজ করার নীতি অনুসরণ। আর নেতিবাচক ভাবে বললে জোট নিরপেক্ষতা নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা নয়, আবার পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখার নীতিও নয়। নেহেরু বলেছে যেখানে স্বাধীনতা বিপন্ন এবং ন্যায়নীতি আক্রান্ত, সেখানে আমরা কখনোই নিরপেক্ষ থাকতে পারি না। বস্তুত জোট নিরপেক্ষতার নীতি করলেও ভারত কখনোই আন্তর্জাতিক বিরোধ অথবা সমস্যা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগভ জোট নিরপেক্ষতা এবং নিরপেক্ষতা এক জিনিস নয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক আইন অণুসারে নিরপেক্ষতা হলো যুদ্ধে

বিবাদমান পক্ষগুলি থেকে দূরে থাকার নীতি। এছাড়া নিরপেক্ষ দেশকে কতকগুলি বাধ্যবাধকতা এনে চলতে হয়। যেমন একটি নিরপেক্ষ দেশ হচ্ছে লিপ্ত কোন দেশকে সাহায্য দিতে পারবে না। দ্বিতীয় নিরপেক্ষ দেশ তার ভূখন্ডকে যুদ্ধরত দেশের আক্রমনের সাহায্যেথে ব্যবহৃত হতে দেবে না। তৃতীয়ত, শুধু যুদ্ধের সময় না, শান্তির সময়েও একটি নিরপেক্ষ দেশ অন্য দেশের সঙ্গে কোনোরূপ সামরিক জোটে লিপ্ত হবে না। কিন্তু একটি জোট নিরপেক্ষ দেশ বৃহৎ শক্তি পরিচালিত কোনো সামরিক জোটে যোগ না দিলেই আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে কোনোবিশেষ পক্ষ অবলম্ব করতে পারে এবং যেকোনো আন্তর্জাতিক সমস্যা নিজের মতামত জানতে পারে। এমনকী বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রকতৃক গৃহীত নীতির বিরোধীতা করতে পারে। কিন্তু একতি নিরপেক্ষ দেশ এই ধরনের কোনো ভূমিকা নিতে পারে না। চতুর্থত, নিরপেক্ষতা ও জোটনিরপেক্ষতারমধ্যে অপর একটি পার্থক্য হলো এই যে, কোনো নিরপেক্ষ দেশকে নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে গণ্য হতে হলে অন্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ কোনো দেশ নিরপেক্ষ দেশের মর্যাদা অর্জন করে তখনই যখন অন্যান্য দেশ সেই মর্যাদা স্বীকার করে। বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে সুইজারলভান্ড, বেলজিয়াম, লাওস প্রভৃতি দেশ নিরপেক্ষ দেশের মর্যাদা লাভ করে।

টিপ্পনী

জোটনিরপেক্ষতার ৫টি নীতি :

জোট নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে নিবমকানুনের কঠোরতা নাথাকলেও কতগুলি নূন্যতম নীতি অনুসরন করতে হয়। ১৯৬১ সালে জুন মাসে কায়রোতে যে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে জোট নিরপেক্ষতার ৫টি নীতি অণুসরণের কথা বলা হয়, যথা -

(১) প্রত্যেক দেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং জোটনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে স্বাধীন নিতি অণুমান করবে বা এই নীতির অনুকূলে সমর্থন করবে।

(২) প্রত্যেক দেশ জাতিয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করবে।

(৩) সংশহলিষ্ট দেশ বৃহৎ শক্তিবর্গের বিচরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত কোনো সামরিক জোটের সদস্য হবে না।

(৪) কোনো সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে দেবে না।

(৫) কোন দেশ যদি দ্বি-পাক্ষিক বা আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা মূলক সংস্থার সদস্য

থাকে, তবে সেই সংস্থার সদস্যপদ যেন বৃহৎ শক্তিবর্গের বিরোধের সাথে জড়িয়ে না থেকে।

এইসব নীতিকে জোট নিরপেক্ষ দেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এইসব নীতির ওপর ভিত্তি করে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি একদিকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করছে এবং অন্যদিকে বৃহৎ শক্তিবর্গের অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, আগ্রাসন ণিতির কঠোর সমালোচনা করেছে।

টিপ্পনী

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন উৎপত্তি ও বিকাশ :

দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তি সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি একতা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে যায় । কোথাও বিনা প্রতিরোধী কোথাও রক্তক্ষবী সংগ্রামের মথভে দিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু পরাধীন দেশ সাম্রাজ্যবাদি শৃঙহখল থেকে মুক্তি পায়। এই সদ্য স্বাধীন দেশগুলির প্রত্যেকের তখন একতাই চিন্তা - ঠান্ডা লড়াই এর পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে নিজের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধিনতা বজায় রাখা যায় এবং কীভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা নেওয়া যায় । এরা প্রত্যেকেই ভেবে নিয়েছিল যে মার্কিন জোট এবং সোভিয়েত জোট কোনো পক্ষেই যোগ না দিয়ে উভয় পক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভবে চলাটাই জাতিয় স্বার্থের অনুকূল হবে। এই ধরনের বিচার বিবেচনা থেকেই তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং কালক্রমে এটি একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

ঠান্ডা লড়াই ছিল জোট নিরপেক্ষতার উৎস ও প্রেরণা। ঠান্ডা লড়াই তুঙ্গে ছিল। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত। সেই সময় জোট নিরপেক্ষতার জন্ম হয়নি।অথচ ১৯৫৬ সাল থেকে রুশ চিন সংঘর্ষের পরিপেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নয় বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হলে ঠান্ডা লড়াইয়ের সঙ্গে জোট নিরপেক্ষতার তেমন একটা কার্যকরণ সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে জোট নিরপেক্ষ আন্দপলনের উৎস ও প্রেরনা খুঁজে পাওয়া যায় তৃতীয় বিশহবের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং রাজনৈতিক মুক্তি পর্বের মধ্যে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতাই ছিল জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রধান ইতিবাচক প্রেরনা।

বর্তমান বিশ্বে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা :

বর্তমান বিশ্বে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের কোনো প্রাসঙ্গিকতা বা গুরুত্ব আছে কিনা এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পর থেকে। অণেকের মতে, যতদিন ঠান্ডা লড়াই ছিল, যতদিন এই পৃথিবীতে দিমেরু প্রবনতা ছিল ও যতদিন আমেরিকার নেতৃত্বাধী জোট সোভিয়ের নেতৃত্বাধীন জোটের মুখোমুখি ছিল - ততদিন জোট নিরপেক্ষ কথাটির অর্থ ছিল। দুই জোটের পরস্পর বিরোধীতা তখন এতই তীব্র ছিল যে, জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি কোনো বিষয়ে যে নীতিই অবলম্বন করুক না কেন , একটি না একতি জোটের সমর্থন সম্পর্কে তারা নিশ্চিত থাকতে পারত । সোভিয়েত রাশিয়ার তথা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ে পর দ্বি মেরুকরনের বিশ্ব একমেরুতে পরিনত হয়েছে । এই একমেরু পৃথিবীতে আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপনত্য ; একানে কোনো জোটই থাকছে না । বর্তমানে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনটি নিছক বাৎসরিক অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

শুধু বর্তমানে নয়, বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই দেখা যাচ্ছে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে কাঠামোগত তারতম্য ও স্বার্থের বৈপরিত্য হযেতু কোনো বিষয়ে ঐক্যমতে ওলৌছানো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আফগানিস্থানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ১৯৯০ - ৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত দেশগুলির মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্য লক্ষ করে সম্মেলনে ভাষনদান কালে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গদ্দাফি সোজাসুজি বলেন - "নিজোট আন্দোলন একটি হাস্যকর আন্তর্জাতিক তামাশা এবং তখন থেকে আমার লক্ষ্য হবে এই আন্দোলনকে নির্মূল করে দেওয়া।"

জোট নিরপেক্ষতা আজও প্রাসঙ্গিক :

কিন্তু অপর একদল আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষজ্ঞের মতে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এই পরিবর্তির পরিস্থিতিতে আগের মতো সমান তাৎপর্যপূর্ণ । এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। জাকার্তায় অণুষ্ঠিত দশম জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে চিনের পরিদর্শক হিসাবে যোগ দেন বিখ্যাত দুই আন্তর্জাতিক রাজনীতি বীশেষজ্ঞ - ডঃ

টিপ্পনী

ওয়ান (Dr. Wan) এবং Dr. Xiao এঁদের মতে ঠানহডা যুদ্ধোত্ত্রকালেও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন আগের থেকে বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাঁরা বলেন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা পশ্চিমি প্রাধান্যবাদে যৌথ হুমকির কাছে বিপন্ন। এই পশ্চিমি প্রাধান্যবাদ আগ্রাসী চরিত্রকে উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করতে পারে একমাত্র জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনই।

টিপ্পনী

নতুন পরিস্থিতিতে জোট নিরপেক্ষতার তাৎপর্য :

বস্তুত সমাবদ্ধতা বসত্ত্বেও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রয়োজন একনও ফুরোয়নি।

প্রথমত, রাজনৈতিক দিক থেকে ঠান্ডা লড়াই এর দিন শেষ হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক ধরনের ঠান্ডা লড়াই বর্তমান দিনে মাথাচড়া দিয়েছে। একদিকে জাপানের সঙ্গে অন্যদিকে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক জোটের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনতিক ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি দুর্বলতা থাকার জন্য জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো দিনই সময় ছিলনা। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির বিরুদ্ধে মার্কিন চাপ বেড়ে যাবে এটাই সআবভাবিক। এই চাপকে কাটিয়ে উঠতে গেলে দরকার জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে আরও জোরদার করা। সবশেষে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার সংরক্ষন করা, উপনিবেশবাদ, সমা্রাজ্যবাদ ও জাতি বিদ্বেষের অবসান ঘটানোন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও আনবিক মারনাশাস্ত্রের প্রসার রোধ করা প্রভৃতি মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি নিজোট আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, সেইসব লক্ষ্য আজও অপসারিত হয়ে যায়নি, বরং পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। তাই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনও তার ক্রমপ্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেনি।

মানবাধিকারের সার্ববজনীন ঘোষণা :

ভূমিকা :

আজকের দিনে যে বিষয়টি নিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী আলোচনা, সমালোচনা ও

পর্যালোচনা চলেছে সেটি হল মানবাধিকার (Human Rights) এর সূত্রপাত যেদিন থেকে (১৯৪৫) সমমিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা 'Universal Declaration of Human Rights' নামে মানবাধিকারের সনদটি গ্রহন করেছে। বিশ্বব্যাপী ঠান্ডা যুদধের পটভুমিকায় জাতিপুঞ্জে যে সনদটি গৃহীত হয়েছিল তা আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষেদর অধিকারের মানদন্ড হিসাবে কাজ করে চলেছে । দবিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তিকালে আন্তজার্তিক চেতনার প্রসার ব্যাক্তি ও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃহত্তর প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকের দিনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুধু রাষ্ট্রকে নিয়েই মাথা ঘামায় না, যেসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে নিয়ে রাষ্ট্র,সেইসব ব্যাক্তি ও গোষ্ঠীর ভালমন্দের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমপর্ক যথেষ্ট আগ্রহী হবে উঠেছে।

টিপ্পনী

মানবধিকারের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি :

সাধারণ ভাবে মানবাধিকার বলতে সেইসব অধিকারকে বোঝায় যেগুলি মানুষের ব্যাক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য । মানবজাতির সদস্য হিসাবে মানুষ কতকগুলি স্বাভাবিক ও শাশ্বত অধিকার ভোগ করে ধাকে এবং এগুলিকে বলা হব মানবাধিকার। মানবাধিকার হল সেইসব শাশ্বত ও স্বাভাবিক অধিকার যেগুলি ছাড়া সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না এবং তার সত্তার বিকাশ ঘটাতে পারে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবধিকার কেন্দ্র এর মতে পৃথিবীর যেকোনো অংশে বসবাসকারী প্রতিটি নারী, পুরুষ অথবা মানুষ হিসাবে যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে, সেগুলি মানুষের সহজাত । আবার অপরদিকে দুর্গাদাস বসু মতে মানবাধিকার হল সেইসব নূণতম অধিকার যেগুলি মনুষ্য পরিবারের সদস্য হিসাবে প্রতিটি ব্যক্তি রাষ্ট্র বা অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভোগ করে।

জীবন ও ব্যাক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, বিশ্বাস ও মতপ্রকাশের অধিকার, কর্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, আইনের দৃষ্টান্ত সাম্যের অধিকার, ভোটদান ও সরকারে অংশগ্রহনের অধিকার, সভা সমিতি গঠনের অধিকার, বসবাসের অধিকার, রাষ্ট্রীয় যথেচ্ছচার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পৌর, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার সমূহ মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে । ১৯৯৩ সালে ভারত সরকার কতৃক প্রনীত 'মানবাধিকার রক্ষা আইন' এর ২ ধারায় বলা হয়েছে ''মানবাধিকার হল ব্যাক্তির জীবন;

স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত সেইসব অধিকার যেগুলি (ভারতিয়) সংবিধান কতৃক স্বীকৃত অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত এবং ভারতের আদালত কতৃক বলবৎ যোগ্য"।

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দুধরনের ভুমিকা :

টিপ্পনী

মানবাধিকারের দুটি দিক আছে এটি নেতিবাচক এবং অপরটি ইতিবাচ। নেতিবাচক দিক থেকে মানবাধিকার বলতে সেইসব অধিকারকে বোথায় যেখানে রাষ্ট্র কখনও হস্তক্ষেপ করবে না। পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি এই পর্যায়ভুক্ত। আর ইতিবাচক দিক ধেকে মানবাধিকার বলতে সেই সব অধিকারকে বোঝায় যেগুলির বাস্তবায়নে রাষ্ত্র সক্রিয় ভুমিকা পালন করবে। আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি এই পর্যায়ভুক্ত। নেতিবাচক অধিকারগুলি বাস্তবায়নে সম্ভব তখনই যখন রাষ্ট্রের ভুমিকা হবে গৌণ।

এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চেহারা হবে ছোট বা ক্ষুদ্রতম থাকে রবার্ট নজিক (Robert Nozik) বলেছেন Ultra mainmast state অপরদিকে ইতিবাচক অধিকার গুলিকে বাস্তবায়নে জন্য রাষ্ট্রকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চেহারটি হবে অতিকায়। এই দুই ধরনের ভুমিকা পালন করতে গিয়ে রাষ্ট্র একদিকে যেমন বিশ্লেষনের যন্ত্র হতে পারে অন্যদিকে সেটি আবাদ জনকল্যানের সংগঠন হয়ে উঠতে পারে।

মানবধিকার অ-হস্তান্তরযোগ্য। এই সব অধিকারকে কেউ অন্যের হাতে তুলে দিতে পারে না। আবার অন্য কেউ এইসব অধিকারকে ধ্বংস করতে বা কেড়ে নিতে পারে না। মানবাধিকার সহজাত। মানুষ জনসূত্রে এই সব আধিকার লাভ করে।

মানবাধিকার সম্পর্কিত ধারনাটির বিবর্তন ও সম্প্রসারন :

মানবাধিকারে ইতিহাস বেশ প্রাচীন। প্রাচীন গ্রিসের স্টোইক দর্শনে এবং রোমের আইন ব্যবস্থায় আনবাধিকারের বীজ নিথিত থাকতে দেখা যায়। তার বেশ কিছুকাল পর ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ড১২১৫ সালে মহাসনদ গৃহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সংকুচিত হতে থাকে এবং মানবাধিকারের বিজয় যাত্রা শুরু হয়।

অতঃপর ইউরোপ বিজয়যাত্রা নবজাগরন ১৬২৮ সালে অধিকার আবেনপত্র

গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮), ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) মানবাধিকারের ধারণাটিকে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ন্যাৎসী জার্মানির মানবাধিকার লঙ্ঘনের বীভৎস কার্যকলাপ বিশ্বের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন শান্তিকামী মানুষকে শঙ্কিত করে তোলে এবং ভবিষ্যতে অন্তরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সচেষ্ট করে তোলে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ সালে ১০ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপঞ্জের সাধারান সভায় গৃহীত হল বিখ্যাত মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা পত্রটি যা মানবাধিকারের যাত্রাপথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টিন।

টিপ্পনী

জাতিপুঞ্জের মানবাধিকারের সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে যেসব অধিকারকে অন্তরভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলিকে দুটি অঙ্গীকারপত্র ভাগ করা হয়েছে - (১) পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পত্র। (২) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত অঙ্গীকার পত্র।

(১) পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পত্র :

ঘোষণাপত্রের ২ থেকে ২১ নং পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত অধিকার সমূহের উল্লেখ আছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জীবন , স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, আইনের সামনে সমানভাবে বিবেচিত হওয়ার ও আইন কর্তৃক সমানভাবে সুরক্ষিত হওয়ার অধিকার যাতাযাতের অধিকার; বসবাসের অধিকার, শন্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার এবং সংস্থা গঠনের অধিকার; প্রত্যক্ষভাবে অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধি মারফৎ পরোক্ষভাবে সরকারে অংশগ্রহনের অধিকার; নিজ নিজ দেশের সরকারি কৃত্যকে যোগদানের ক্ষেত্রে সমানাধিকার; যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে অব্যাহতির অধিকার; চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার অধিকার, বয়স্ক নরনারির বিবাহ করার অধিকার, পরিবার গঠনের এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ ধেকে ই পরিবার সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার; প্রত্যেকের নাগরিকত্ব লাভ ও বদলের অধিকার এবং নাগরিকত্ব যথেচ্ছভাবে বঞ্চিত না ওয়ার অধিকার ইত্যাদি।

(২) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত অধিকার সমূহ :

ঘোষণা পত্রের ২২ থেকে ২৭ নং ধারা গুলিতে উল্লেখযোগ্য। কর্মের অধিকার, কর্মক্ষেত্রে ন্যয্য ও অনুকূল পরিবেশে থাকার অধীকার, বেকারত্ব থেকে মুক্তির অধিকার, বৈষম্য ছাড়া সমান বেতন পাওয়ার অধিকার; নিজ স্বার্থ রক্ষার অধিকার;

টিপ্পনী

প্রত্যেকের শ্রমিক সংঘ গঠনের ও তার সদস্য হওয়ার অধিকার; বিশ্রাম বা অবকাশ যাপনের আধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা পাবার অধিকার; শিক্ষার বিশেষ করে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার; নিজের ও পরিবারে স্বাস্থ্যও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য উপযুক্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার অধিকার। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি অংশ গ্রহনের এবং তার সুফলের ভাগ নেওয়ার অধিকার ইত্যাদি।

১৯৪৮ সালে বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণায় যেসব অধিকার উল্লিখিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার গুলিই প্রাধান্য পেয়েছে। ক্রিয় ব্রাউন ডঃ রাধারমন চক্রবর্তী প্রমুখ বিশেষজ্ঞগন এই সব অধিকারকে প্রথম প্রজন্মের অধিকার হিসবাএ চিহ্নিত করেছেন।

বর্তমানে মানবাধিকার ধারনাটি তৃতীয় প্রজন্মে ক্রমে পৌঁছেছে । মানবাধিকারের ধারনা আজ শুধুমাত্র ব্যাক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, মানবধিকার রক্ষা বলতে আজ আর শুধু মানুষের ব্যাক্তিগত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষাই বোঝায় না, এই সঙ্গে বোঝায় কোনো দেশ বা জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং বিকাশের অধিকার। মানবাধিকার ধারনার মধ্যে আজ নাগরিক ও রাজনীতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সমাজিক ও সংস্কৃতিক অধিকার গুলিও অন্তভুক্ত ; ঠিক তেমনি অন্তরভুক্ত ব্যাক্তিগত ও সমষ্টিগত মানবাধিকার।

বিশ শতকের ষাটের দশকে প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি ইত্যাদির ফলে যেসব পরিবর্তন পরিবর্তন ঘটেছে; পৃথিবীর সব দেশের বা সবশ্রেনীত মানুষের তাতে উপকার হয়েছ তা নয়। শিল্পায়ন একদিকে যেমন পুঁজিপতি শ্রেনির মানুষের তথা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। অন্যদিকে তেমনি তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল শ্রেনীর মানুষের দুর্গতি বাড়িয়েছে। বনাঞ্চলে ধ্বংস করেছে, উপজাতি শ্রেনীর মানুষদের বাস্তুচ্যুত করেছে অথবা তাদের সাবেক জীবনে আঘাত হেনেছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্টথ করছে, দূষণের মাত্রা বাড়ীয়েছে। এসবের প্রেক্ষিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দাবিতে নানা ধরনের আন্দোলন দানা বেঁধেছে। পশ্চিমী জগতের মানুষ দূষন বিরোধী এবং শান্তিসূচক আন্দোলন সংগঠিত করেছে ; অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ যুদ্ধ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দূষণমুক্ত পরিবেশ বাঁচার অধিকার, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মুক্তির অধিকার, পৃথিবীর সমস্তশ্রেনীর আনুষের

জীবন ধারনের জন্য নূণতম সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার এগুলিই হল আজকের দিনের মূল দাবি এবং এগুলিকেই বলা হচ্ছে তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার।

মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি :

মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি কোনো সমাজ নিরপেক্ষ বিমূর্ত ধারনা নয়; কালভেদে এবং দেশ ভেদে ধারনাটি পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উৎপাদিকা শক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের পটভূমিকায় সামন্ততান্ত্রিক রাজকীয় ও ধর্মীয় কতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সাম্য ও সমানধিকারের ধারণাকে জনপ্রিয় করা হয়। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্যাপোক ধ্বংসলীলা এবং নৃশংস ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের দুঃসহ স্মৃতি সারা পৃথিবীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল মানবাধিকারকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেবার এবষং এ প্রসঙ্গে একটি সর্বসম্মত নূন্যতম কর্মসূচি প্রনয়ন করার জন্য। সাধারণসভা কতৃক গৃহীত হল মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র।

মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদের ভিত্তিতে পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের যখন আলাপ আলোচনা চলছিল তখন দেখা যায় জাতিপুঞ্জের সদস্যগুলির মধ্যে তখন দেখা যায় জাতিপুঞ্জের সদস্যগুলির মধ্যে ঐক্যমতের অভাব। আসলে ততদিনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে, শুরু হয়ে গেছে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধী যথাক্রমে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিষবিরে ঠান্ডা লড়াই এই দুই শিবিরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত মৌলিক পার্থক্য থাকার জন্যই চুক্তিপত্রে প্রনয়নের জন্য এক মত হতে পারেনি। সমাজ তান্ত্রিক ও সদ্যস্বাধিন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি চেয়েছিল চুক্তিপত্রে অনভান্য অধিকারের সঙ্গে কাজের অধিকার, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকার গুলিকে অন্তভুক্ত করতে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা মেনে নিতে পারেনি।

১৯৮৯ সালে চিনের নতুন প্রজন্মের বিদ্রোহ দমনে তিয়েন সান মেন স্কোয়ার এ বভাপক বলপ্রোগের প্রতিবাদে মার্কিন প্রশাসন চিনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা চালু করে এবং তাকে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের মর্যাদা দানে বিলম্ব টায়। আবার সেই আমেরিকাই ১৯৮০ দশকে নিকারাগুয়ার অগণতান্ত্রিক ও অত্যাচারী শাসক

টিপ্পনী

সোমেজাকে পূর্ণ মদত দেয় ব্যাপক গণহত্যার কাজে।

সারা বিশ্বে গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য মানবাধিকার রক্ষার জন্য মার্কিন প্রশাসনের চোখে ঘুম নেই। অথচ স্বার্থে আঘাত লাগলে বা স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে সেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এর আদর্শকে নষ্ট করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। মার্কিন মদত পুষ্ট শাহ জমানা ইরানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক কুৎসিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কেবল ভিয়েতনামই মার্কিন সেনারা বোমা বর্ষন করে, নির্বিচারে গণহত্যা চালায়, রাসায়নিক বিষ ও বিষাক্ত গভাস ছড়িয়ে গাছপালা, শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে। ১৯৬৫ সালে অক্টোবরে মার্কিন গোয়েন্দা CIA এর প্রত্যক্ষ মদতে ইন্দোনেশিয়াতে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

টিপ্পনী

যে সমস্ত উপায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তার সাঙ্গপাঙ্গ তৃতীয় বিশ্বের ব্যাপক মানুষকে স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম গুলিও তাদের নিয়ন্ত্রণ। পৃথিবীতে যত বিদেশী সংবাদ মাধ্যম রয়েছে তার নব্বই শতাংশই নিয়ন্ত্রিত হয় উত্তর গোলার্ধের চারটি সংবাদ সংস্থার দ্বারা। সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রিত করে কীভাবে বীশ্বজনমতকে প্রভাবিত করা যায়, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ইরাক যুদ্ধেদর সময়। এইভাবে হাজার হাজার দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রমাণ করা যায় সংবাদ মাধ্যমগুলির ওপর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির একছত্র নিয়ন্ত্রণ কীভাবে ব্যাপক মানুষের প্রকৃত সংবাদ ও তথ্য জানার অধিকার হরণ করেছে এবং সত্য ও ন্যায় বিচারের পক্ষে দাঁড়াবার সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে।

ওপেরর সমালোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে মানবাধিকার ধারণা কোনো বিমূর্ত শ্রেণী উর্ধ্ব ধারনা নয় এর পিছনে রয়েছে রাজনীতি । যারা যে অস্ধাননে আছে, সেইভাবে তারা মানবাধিকারকেব্যাখ্যা ও ব্যবহার করে । বিশ্বের উন্নত দেশগুলির উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর বিভিন্নভাবে মানবাধিকার রক্ষার নামে ক্ষতিগ্রস্থ করে । এবং পরিসেষে এই কথা বলা যায় যে বিশ্বব্যবস্থাকে সমূহে উৎপাটিত করাটাকেও মানবাধিকার রক্ষার কর্মসূচিতে স্থান দিতে হবে।

নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

১৯৭৪ সালের মে মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার ষষ্ঠ বিশেষ

অধিবেশনে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নতিবিধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহন করা হয় যা নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা নামে পরিচিত। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমাগ্রিক ভাবে বীশ্ব অর্থণীতির উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্খের ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তইতে স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক, রাজনতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে অধিকার প্রদান। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তি, মুলধন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ও সদ্ব্যবহারে মাধ্যমে এমন একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নির্মান করা সেখানে ছোট বড়ো সকল রাষ্ট্রের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলি তাদের ন্যায্যা প্রাপ্য পাবে।

টিপ্পনী

নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভবের প্রেক্ষাপট :

বিশ্বব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার, গ্যাট, প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তৃতীয় বিশ্বের অণুন্নত দেশগুলির আশা আকাঙ্খা ও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। তাছাড়া এই সব সংস্থার কাজকর্ম পক্ষপাতদুষ্ট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের কাজকর্ম ও নীতি উন্নত পুঁজিবাদি দেশগুলির অনুকূলে অন্যদিকে স্বল্পোন্নত দেশগুলি স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে। UNCTAD এর কাজকর্ম ও তৃতীয় বিশ্বের কাছ যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক। UNCTAD এ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যার দূর করে তাদের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করার সে লক্ষ্য গৃহীত হয়েছিল। সেই লক্ষ্যও পূরণ হয়নি। এছাড়া বিশ্বের উন্নত দেশগুলি নিজেদেদর মধ্যে নানা ধরনের বানিজ্যিক জোট বা সংগঠন তৈরি করেছে। যেমন ইউরোপীয় সংঘ, উত্তর আমেরিকা মুক্ত বানিজ্য চুক্তি ইত্যাদি। এইসবের ফলে দক্ষিণের দেশগুলি ক্রমেই উত্তরের দেশগুলির উপর নির্ভরশিল হয়ে পড়ে। এই ধরনের এক প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাপে দক্ষিনের উন্নয়নশীল দেশগুলি একটি নতুন অর্থনৈতিক বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানাতে থাকে, যাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বাণিজ্য হার আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থান প্রযুক্তির হস্তান্তর, অর্থনৈতিক সাহায্যে প্রভৃতি বিষয়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদেদর বিশ্বাস ছিল এই ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে বিশ্বব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতির মর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির নীতি নির্ধারণে তারা কার্যকর অংশ নিতে পারবে। এইসবের যৌথন প্রভাবে ১৯৭৪ সালের ১লা মে জাতিপুঞ্জেদর সাধারণ সভা নয়া

আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা বা NIEO প্রতিষ্ঠা বিষয়ে একটি ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচী গ্রহণ করে।

ঘোষণাপত্র :

টিপ্পনী

জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় একটি সাম্যভিত্তিক ও ভারসাম্যমূলক আন্তর্জাতিক সমাজ গঠন অসম্ভব বলে প্রমাণীত হয়েছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে। বর্তমানের আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিকর ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ১৯৭০ সাল থেকে উন্নয়নশিল দেশগুলি একটি শক্তিশালী উপাদানে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের শক্তি সম্পর্কের এই দুর্নিবার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যেকোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির সক্রিয় সমগুণ ও সমাজতান্ত্রিক অংশগ্রহন বা একান্ত প্রয়োজন।

NIEO-র নীতিসমূহ :

তৃতীয় বিশ্বের নেতৃবৃন্দের দাবি ছিল যে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা নিম্নলিখিত নীতিগুলির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে-

(১) বিশ্বের অর্থনতিক সমসভাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে সকল দেশের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ।

(২) প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলির ওপর পূর্ণসার্বভৌম অধিকার।

(৩) এই ধরনের অপরিহার্য অধিকারের বাধাহী ও পূর্ণ প্রয়োগের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো চাপের কাছে নাতিস্বীকার না করা।

(৪) প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ নিজ সুবিধা অণুযাবী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার।

(৫) কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হওয়ার অধিকার।

NIEO রউদ্দেশ্যসমূহ :

নয়া আন্তর্জতিক অর্থব্যবস্থার উদ্দেশ্য গুলি হল নিম্নরূপ :

(১) আন্তর্জাতিক বিষয়ে নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে দরিদ্র দেশগুলির অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(২) উন্নতও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ব্যবধান ও ক্রমবর্ধমান অসমতা দূর করা।

(৩) উন্নত দেশগুলি কতৃক উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্যের পরিমান বাড়ানো যাতে বিশ্বসম্পদের সুষম বন্টন সুনিশ্চিত হয়।

(৪) লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য হীনতা, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি, ঋণ সংকট প্রভৃতি স্বল্পোন্নত দেশগুলির প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করা।

(৫) দক্ষিন - দক্ষিন সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো।

(৬) উন্নয়নের স্বার্থে বহুজাতিক কর্পোরেশনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ।

(৭) বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থাকে সংস্কার করা যাতে আন্তর্জাতিক বানীজ্য ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মের প্রসার সাধন হয়।

NIEO এর প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচি :

নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যনবস্থার কর্মসূচিতে কতকগুলি সংস্কারমূলক প্রস্তাব বা সুপারিশ স্থান পেয়েছে। যথা -

(১) NIEO এর কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিব্যবস্থার সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় গ্যাট (GATT) এর নিয়মবিধির দ্বারা । নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার গ্যাটের নিয়মবিধি সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পণ্যদ্রব্য বিষয়ে সুসংগবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহন, সাধারণ তহবিল গঠন, ক্ষতিপূরণমূলক অর্থসংস্থানেদর সুবিধা ও উন্নয়নশিল দেশের বৈদেশিক বানীজ্য বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে।

(২) NIEO এর কর্মসূচীতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবোজন আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক আচরণবিধি প্রনয়নেদর পন্য সুপারিশ করা হয়েছে । বিজ্ঞান ও

টিপ্পনী

প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ব্যাতিরেখে দক্ষিনের বৈষয়িক বিকাশ কোনো প্রকারে সম্ভব নয়। অথচ এই প্রযুক্তিগত কলাকৌশলটি দক্ষিনের আয়ত্তের বাইরে । এর হস্তান্তরের নিয়মবিধি উত্তরের ধনী দেশগুলি নির্ধারন কনরে। দক্ষিন মনে করে প্রচলিত নিয়ম বিধি ও এক্তিয়ার সংশোধন না হলে দক্ষিএর দেশগুলির ঈঙ্গিত বিকাশ সম্ভব হবে না।

টিপ্পনী

(৩) প্রচলিত আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা বিশ্বের অর্থ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে । তাই এর সংস্কার সাধনের সুপারিশ করা হয়েছে যাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন মূলক কার্যের প্রসারসাধন হয়।

(৪) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্ধায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং একসঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিসম্পদন বৃদ্ধির জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে।

(৫) উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যেযৌথ আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বানিজ্য, সম্পদ, শিল্প ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক সহযোগিতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

(৬) উন্নয়নশীল দেশেদর অর্থনীতির ওপর বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্ষতিকারক প্রভাব হ্রাসের উদ্দেশ্যে NIEO বহুজাতিক সংস্থাগুলির ব্যাপারেও একটি আচরণবিধি প্রনয়নের সুপারিশ করেছে । দক্ষিনের দাবি হল বহুজাতিক সংস্থাগুলি দক্ষিণাঞ্চলের উৎপাদন ও বিপনন উভয় বিধ কাজ করতে পারবে। তবে সংস্থাগুলির কাজকর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার অধিকার দক্ষিনের দেশগুলির থাকবে।

(৭) নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার কর্মসূচীতে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সুবিধাজনক শর্তে সাহায্যেদান বা ঋণভারে জর্জরিত দরিদ্র দেশগুলিকে ঋণসংক্রান্ত সুবিধাদানের প্রভাব করা হয়েছে। দক্ষিনের বক্তব্য হল দীর্ঘদিন বিদেশি শাসনের অধীনে থাকার ফলেই দক্ষিনের অধিকাংশ দেশ উত্তরের কাছ ধেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই উত্তরের দেশগুলি যেন ঋণ পরিশোধের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে। এছাড়া বিশ্বব্যঙ্ক আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যঙ্ক গুলির মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলিতে অধিক সম্পদ প্রেরণের সুপারিশ করা হয়েছ।

প্রশ্নমালা :

১. নয়া উপনিবেশবাদের সংজ্ঞা দাও। এর প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর।

২. নয়া উপনিবেশবাষদের বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল গুলি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাও।

৩. নয়া উপনিবেশবাদের সুফল ও কুফল নিয়ে আলোচনা কর।

৪. তৃতীয় বিশ্বের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য কি ?

৫. তৃতিয় বিশ্বের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর।

৬. নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ ? এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাও।

৭. জোট নিরপেক্ষতা বলতে কি বোঝ ? এর উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা কর।

৮. জোট নিরপেক্ষতার কার্যকারিতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাও।

৯. মানবাধিকারের সংজ্ঞা দাও। সার্বজনীন মানবাধিকারের বিস্তারিত আলোচনা কর।

১০. জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রের বিস্তারিত আলোচনা কর।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. রাধারমন চক্রবর্তী, সুকল্পা চক্রবর্তী - সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা - ২০০৯

২. নির্মলকান্তি ঘোষ, পিতম ঘোষ, - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, শ্রীভূমি পাবলিশিং, কলকাতা - ২০০৪

৩. শক্তি মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংগঠন ও পররাষ্ট্র নীতি, ওয়ার্ল্ড প্রেস, কলকাতা - ২০০০

৪. অনীক চট্টোপাধ্যায় - ঠান্ডা যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০১২

৫. গৌতম কুমার বসু - সমসাময়িক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০১২

৬. প্রাণগোবিন্দ দাশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা) লিমিটেড, কলকাতা - ২০১১

টিপ্পনী

৭. গৌরিপদ ভট্টাচার্য - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০০৪

৮. আরূপ সেন - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব ও তথ্য, নবোদয় পাবলিকেশনস, কলকাতা - ২০১২

৯. ড. অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সেন্ট্রাল পাবলিশিং, কলকাতা - ২০০৪

১০. অঞ্জনা ঘোষ - ঠান্ডাযুদ্ধ উত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংকট ও প্রবণতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ,কলকাতা - ২০০৭

১১. বানীপদ সেন - সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়, বিন্যাস ও ব্যাখ্যা ; বিক্রম প্রকাশক ২০১০

টিপ্পনী

একক -৪ : আন্তর্জাতিক সংগঠন

ভূমিকা :

টিপ্পনী

আন্তর্জাতিক সংগঠনকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি পর্যায় রূপে চিহ্নিত করা যায়। সল্পাকারে বললে যে সংগঠন জাতি রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমানাকে অতিক্রম করে একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে নানাবিধ বিষয়ে সম্পর্ক স্থাপ করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান ও সহযোগিতার পরিমন্ডলন গড়ে তোলে তাকে আমরা আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে পার। অধ্যাপক কুইন্স রাইট এর দাবী কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সমাজের গঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থাকেই আন্তর্জাতিক সংগঠন নামে আবিহিত করা যায়। সাধারনভাবে বলা যায় আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংগঠন। আইন গত দিকম থেকে বিচার করলে বলা যায়, আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো সন্ধির মাধ্যমে গঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের একটি সমষ্টি বিশেষ। যার একটি সংবিধান ও বেকটি সংস্থা আছে; একতি স্বতন্ত্র আইনগত সত্ত্বা আছে।

যাইহোক, আন্তর্জাতিক সংগঠন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপূনরণের জন্য গঠিত হয়। পি বি পটার তিনটি উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন -

(ক) জাতি সীমানার বাইরে থেকে দাবি পুরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ।

(খ) এর জন্য আন্তর্জাতিক আদান - প্রদান, জাতিয় রাষ্ট্র তার অধীনস্থ নাগরিক এবং পদস্থকর্মচারিদের তরফ থেকে আদান প্রদানের ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য সহযোগিতা সৃষ্টি।

(গ) আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ও হিংসা প্রতিরোধ।

পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংগঠনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বভাতিত এই পাঠ্য বিষয়টির প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

টিপ্পনী

এর আলোচনার বিষয়বস্তু হল আন্তর্জাতিক স্যোগিতার সংগঠীত পোদ্ধতি এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই সহযোগিতার মাথ্যমে প্রত্যাশীত ফলাফল সম্পর্কে ধারনার বিশ্লেষণ ; আন্তর্জাতিক সংগঠনের ইতিহাস, গঠন, কার্যাবলী এবং তার ফলাফলের আলোচনা; বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া; আন্তর্জাতিক রাজনিতি সম্পর্ক এবং সংগঠনের সম্পর্ক; বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সম্পর্ক ; আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংগঠনের মধ্যকার সম্পর্কে ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক সংগঠন উপরোক্ত বিষববস্তু এবং মধ্যেকার সম্পর্ককে বাস্তবে রূপ দিতে মতৈক্য, সহযোগিতা, পারস্পরিক মত বিনিময়এর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। বলপ্রয়োগ, বিরোধ এবং ভীতি প্রদর্শনের ব্যবস্থাকে প্রতিরোধের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংগঠন বিশ্বশান্তি প্রতিভূতে পরিণত হয়। অনেক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষক এমন দাবি ও করেছেন, আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্দেশ্য হলন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার সাহায্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক বিরোধ ও যুদ্ধকে ন্যূনতম পর্যায়নে সীমিত রাখা, নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সমাগ্রিক ভাবে মানবজাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যানের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমবায়মূলক ও অগ্রগতি সাধন কার্যাবলীর বিকাশ এবং সর্বোপরি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিতি করা আন্তর্জাতিক সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

এককের মুখ্য বিষয়বস্তু :

আন্তর্জাতিক সংগঠন নামক এই এককে যে মুখ্য বিষয়গুলি সথান পেয়েছে তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এক নবতম সংযোজন বলে উল্লেখ করা যায়। এক কথায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি, পরিধি এবং বিষয়বস্তুর নবতম সংযোজন বলে ধরে নেওয়া হয়। আলোচ্য এককে প্রথমেই স্থান পেয়েছে বিংশ শতাব্দীতে দুই দুইটি বীশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে গঠিত দুটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সংগঠন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাককালে শান্তি প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে জন্ম নিয়েছিল লিগ অব নেশসেন্ সালটি ছিল ১৯১৯। যদিও এই শান্তি প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়

এবং লিগ তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। উল্লেখ্য এই লিগই বিশ্বের প্রথম প্রকৃত আন্তর্জাতিক সংগঠন। যাইহোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসম্ভাবী হয়ে পড়ে একই সঙ্গে লিগ ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। যুদ্ধ শেষে আবার শান্তিকামি বিশ্ব নেতারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি নতুন করে খতিয়ে দেখতে উদ্যোত হয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে লিগ এর আদলে এবং অণেক বেশী কার্যকরী আন্তর্জাতিক সংগঠন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে অগ্রণী ভুমিকা নিতে এগিয়ে আসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ইউনাইটেড নেশনস্। যাকে এককথায় বলে একটি ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট। নিউইয়র্কের অবস্থিত যেখানে ১৯৩ টি কণ্ঠ একসাথে বসে বীশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সংগঠনটি ১৯৪৫ সালে ২৪ শে অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় ৪ টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংগঠনটি যাত্রা শুরু করে এক - শান্তি, দুই - বন্ধুত্ব, তিন - জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং তার - লক্ষ্য অর্জন।

টিপ্পনী

লিগের চুক্তিপত্র :

প্রথম মহাযুদ্ধের পর আত্মপ্রকাশ করেছিল লিগ অব নেশনস ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে গঠিত হল রাষ্ট্রসংঘ বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। এই দুই আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন। এই কারণে শতকে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সুবর্ণযুগ বলা হয়। যাইহোক শেষেও সংগঠন বহু বিষয়ে পূর্বোক্ত সংগঠনের কাছে ঋণি। কারণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের লিগ এর হুবহু নকল বলা যায় না। আসলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ লিগের কাছে ঋণী ঠিকই তবে লিগের কাজকর্ম ও অভিজ্ঞাতাকে বহুল পরিমাণে কাজে লাগিয়ে নিজের উন্নতি বিধান করেছে।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় লিগের একটি চুক্তিপত্র ছিল। কিন্তু প্যারিস শান্তি সম্মেলনে যে শান্তিচুক্তি হয়েছিল তার একটি অংশ হিসেবে লিগ চুক্তিপত্র স্থান পেয়েছিল। এর বাহিরে চুক্তিপত্রের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। অন্যদিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি সনদ আছে যা ১১১ টি অনুচ্ছেদ, ১৯টি অধ্যয় ও সর্বোপরি একটি প্রস্তাবনায় বিভক্ত। কিন্তু এর মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈশাদৃশ্য বিদ্যমান।

একথা ঠিক লিগের চুক্তিপত্র ভার্সাই চুক্তির একটি অংশ। ভার্সাই শান্তি সম্মেলনে লিগের চুক্তিপত্র রচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। মার্কিন উড্রো

টিপ্পনী

উইলসন এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। প্রেসিডেন্টের ঘোষিত নীতি এবং ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের আইনগত নৈপূন্যের সমন্বয়ে লিগের চুক্তিপত্র বাস্তবরূপ লাভ করেছিল। ১৯১৯ সালের ২৮ শে জুন ভার্সাই সম্মেলনে চুক্তিপত্র গৃহীত হয় এবং ১৯২০ সালের ১০ ই জানুয়ারী বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে লিগ অব নেশনস্ যাত্রা শুরু করে। এই চুক্তিপত্রে একটি প্রস্তাবনা এবং ২৬ টি ধারা ছিল। লিগের তিনটি মুখ্য সংস্থা ছিল - সভা, পরিষদ এবং সচিবালয়। যদিও পরে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা এবং স্থায়ী আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়।

লিগই প্রথম প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে মানবজাতির সম্মুখে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং সম্প্রীতির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। লিগকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের মানসপুত্র বলা হয়। যুদ্ধ বিধস্ত ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে চৌদ্দ দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তার মধ্যে লিগের ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব ছিল। যাইহোক লিগের চুক্তিপত্রের কোথাও স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়নি। চুক্তিপত্রের প্রারম্ভেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার ও আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহন করা হয়েছিল। কারণ যে সংকটময় পরিস্থিতির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে লিগ জন্ম নিয়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই এর চুক্তিপত্রের রচয়িতাগণ এক যুদ্ধযুক্ত পরিবেশ ও এরই আদলে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই কারণেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বঅর্জন করেছিল।

যুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই চুক্তিপত্রে একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে কোন পরিস্থিতিতে তারা যুদ্ধের আশ্রয় না নেবার নীতি মেনে চলবে। চুক্তিপত্রে বলা হয়েছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সৌভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে প্রত্যেকের মধ্যে ন্যয়সঙ্গত, সম্মানজনক এবং অবাধ সম্পর্কের মাধ্যমে যুদ্ধের যুদ্ধের সর্বনাশা পরিস্থিতি এবং আতঙ্ক থেকেই মানবজাতি লুপ্ত হতে পারে।

লিগের চুক্তিপত্রের মুখবন্ধে সকল সরকারের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। একমাত্র আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে

সকল সরকারের আচরণের মধ্যে সমজাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

চুক্তিপত্রে ন্যায়বিচার সংরক্ষণ এবং প্রতিটি দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সন্ধি -সংক্রান্ত সকল বাধ্যবাধকতা পালনের অভিপ্রায় ও অঙ্গীকার সংযোজিত হয়েছে। চুক্তিপত্রের ৮নং ধারায় অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাসের কথা বলা হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের কোন প্রস্তাব ছিল না।

টিপ্পনী

চুক্তিপত্রের ১০ নং ধারায় পচরতিরোধের উদ্দেশ্য মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আগ্রাসনের কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়নি। ১২ নং ধারায় অন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধকে মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল। ১৩ নং ধারায় বিরোধের বিচারের জন্য বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা ও ছিল। উপরন্তু চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারায় যৌথভাবে আগ্রাসন প্রতিরোধের ব্যবস্থা ছিল।

লিগ চুক্তিতে সংযোজিত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে অন্তঃরাষ্ট্রীয় বিদ্বেষ, ক্ষমতা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, লিগের অন্তর্নিহিত সাংগঠনিক দুর্বলতা, নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের উদ্ভব, অস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতা, যুদ্ধবন্ধের ব্যাপারে যৌথ প্রয়াসের অভাব এবং অনবরত আগ্রাসনের ফলনে লিগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে এই দুর্বলতা এবং ব্যর্থতা পাশাপাশি দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধের চরম পরিণতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ রচয়িতাদের আরো শান্তি কামী করে তুলেছিল। এবং নতুন এই সংগঠনের নীতি ও লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য রচনার যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ :

ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে যুদ্ধ লুপ্ত করতে এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতি উৎস ব্যার্থ হলে, এই প্রচেষ্টা যে থেমে থাকেনি তর জলন্ত প্রমাণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। যা লিগের মতো কিন্তু আরোও উন্নত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ১৯৪১ সালে মিত্র শক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি নিজেদের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামে সংগঠিত করতে আরম্ভ করলে ১৯৪৩ সালে মস্কো ঘোষণায় দাবী করা হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্য ছোট বড় সকল রাষ্ট্রকে একটি ছত্রছায়ায় এনে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন। এবং

টিপ্পনী

এবিষয়ে সমদূর অগ্রসর হওয়া জরুরী। এই পরিকল্পনা কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বাস্তবায়িত হয়। পর্যায় গুলি যথাক্রমে ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত তেহরান সম্মেলন, ১৯৪৪ সালে ডাম্বারটোন ওকস সম্মেলন এবং ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত ইয়াল্টা সম্মেলন ও সামফ্রানসিস্‌কো সম্মেলন। উল্লেখ্য ডাম্বারটোন ওকস্‌ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহনকারী চারটি রাষ্ট্র যে যে প্রস্তাব নিয়ে আসে, তার উপর ভিত্তই করেই সানফ্রানসিসকো সম্মেলনে পঞ্চাশটি রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামক আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরী হয় এবং লিগ চুক্তি পত্রের আদলে একটি সনদ রচিত হয়।

একথা সত্যি যে, লিগ চুক্তি পত্রের বিভিন্ন ধারায় যে লক্ষ্য রীতি এবং প্রস্তাবিত শর্তাবলীর কথা পূর্বে উল্লিখিত তাকে আরো পরিমার্জন এবং যুক্তি সঙ্গত ন্যায় সঙ্গত ও গ্রহণীয় করতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে পূর্বর যৌথ প্রচেষ্টাকে আরো শক্তিশালী করে সনদ রচনা করা হয়। উদ্দেশ্য রীতি পরবর্তী এককে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই এককে সনদের প্রস্তাবনার লক্ষ্যগুলি বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

সম্মলিত জাতিপুঞ্জের সনদে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ :

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে একটি সনদ রয়েছে, তার মধ্যে অনেক কটি ধারার উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি ছাড়াও এই সনদের একটি প্রস্তাবনা রয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামের যে আন্তর্জাতিক সংগঠনটি রয়েছে তার লক্ষ্যগুলি উল্লিখিত আছে এই প্রস্তাবনায়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের লক্ষ্যগুলি নিম্নরূপ -

(১) লক্ষ্য রাখতে হবে, - যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যুদ্ধের ভয়াবহ ও সর্বনাশ পরিণতি থেকে দূরে থাকতে পারে।

(২) লক্ষ্য রাখতে হবে যে সমাজে সকলের সমানাধিকারের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা থাকে।

(৩) এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি যে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করবে, তার প্রতি যেন যথাযথ সুবিচার সম্মান প্রদর্শন করা যায়।

(৪) মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৫) মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কিছু স্থায়ী - কল্যাণমূলক কার্যাবলী নিতে হবে যাতে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ ও অগ্রগতি হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এইসমস্ত লক্ষ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই সংগঠনতির সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে কিছু কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। যেগুলি হল -

টিপ্পনী

(১) সহনশিল মনোভাব ও হিতৌষী প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব নিয়ে একে অন্যের সাথে শান্তিপূর্ণরূপে বসবাস করব।

(২) আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য নিজেদের শক্তিকে সুসংগত করবে।

(৩) শুধুমাত্র যৌথ স্বার্থের জন্য ছাড়া নিজেদের সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করা যাবে না।

(৪) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সব মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কাজ করবে।

(৫) সম্মিলিকত জাতিপুঞ্জের লক্ষ্যমাত্রাগুলি যাতে সঠিকরূপে বাস্তবায়িত হয়, তার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত এই সংগঠনের লক্ষ্যগুলির অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সংগঠন নানান ভাবে সমালোচিত হয়েছে। সমালোচনার সেই ক্ষেত্রগুলি হল -

(১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের লক্ষ্যগুলি, সনদের প্রস্তাবনার ধ্যে সন্নিবেশিত, কিন্তু প্রস্তাবনার যেহেতু কোনো আইনগত গুরতুব থাকে না, তাই এই লক্ষ্যগুলিরও কোনো আইনগত গুরুত্ব নেই। এই লক্ষ্যগুলি কার্যকর করারক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারলয়ে কোনো আবেদন করা যায় না।

(২) আজকাল দেখা যায়, বীশ্বশান্তি রক্ষার নামে বৃহৎ ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলি, ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে আক্রমণ করে থাকে এবং এইসব ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা নীরব দর্শকের ন্যায়।

(৩) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় অনেক বড় বড় মহান লক্ষ্যের

কথা বলা হয় যেমন - সহনশীলতার নীতি, নারীপুরুষদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ভাল প্রতিবেশিসুলভ মনোভাব ইত্যাদি। কিন্তু সমালোচকদের মতে, মূল সনদে এগুলির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

টিপ্পনী

(৪) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি অন্যতম লক্ষ্য হল সমাজে সকলে অন্তরে সমানাধিকারের প্রতি সুগভীর বিশ্বাস আস্থা স্থাপন করা। কিন্তু দেখা যায় এই সংগঠনের অভ্যন্তরেই এই নীতিটি কার্যকর হয়নি। এই সংগঠনে অস্থায়ী সদস্যদের তুলনায় পাঁচটি স্থায়ু সদস্য রাষ্ট্র বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। কারণ এর Veto এর ক্ষমতা ভোগ করে। ফলে বাস্তবক্ষেত্রে বলা যায় যে - সমানাধিকারের নীতিটি কার্যক্ষেত্রে গুরুত্বহীন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ:

দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং ধ্বংসলীলা বীশ্বমানের জাতিকে আতঙ্কিত করে তোলে । এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এবং বিশ্বনেতারা শান্তিসাম্যের পরিবর্তে যৌথ প্রয়াস কে আরোও মজবুত ভাবে কাজে লাগাতেআন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপোআরে উদ্যোগী হয়। এই প্রয়াসের ক্ষেত্রে যে মুখ্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল আন্র্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি সবিনয়ে খতিয়ে দেখা। তবে এই মুখ্য বিষয়ে উপনীত হওয়ার জন্য যুদ্ধ তথা অশান্তির মূল কারণগুলিকে নির্মূল করা দরকার। তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম উদ্দেশ্য হল বিশ্বজুড়ে সামাজিক, সাংস্খৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা এবং এক গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরী করা।

যাইহোক, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সান্তব্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে ডামবারটন ওকস্ সম্মেলনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয় । আলোচ্য আন্তর্জাতিক সংগঠনটির সাফল্যের স্বার্থে এর উদ্দেশ্য কি কি হবে তা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। এ বিষবে সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী সকলে অভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন । সানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে ম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কিত আলোচনার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।এবং সিদ্ধান্ত হয় আন্তর্জাতিক সগঠন হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সার্থক করে তুলতে হলে এর উদ্দেশ্য ও

নীতিসমূহের সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট উল্লেখ একান্তভাবে অপরিহার্য। তাই তাঁরা সনদের শুরুতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

উদ্দেশ্য সমূহ :

টিপ্পনী

কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অভিপ্রায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামক আন্তর্জাতিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সনদের ১ নং ধারায় ৪টি উদ্দেশ্যর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে -

(১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মুখ্য উদ্দেশ্য। শান্তিপূর্ণভাবে সকল বিরোধ নিরসন করার প্রচেষ্টা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গ্রহন করে থাকে। এক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তার কার্যক্রম স্থির করে। শান্তি বিঘ্নিত হয় এমন সকল উদ্যগে জাতিপুঞ্জের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে বাধা প্রদান করে।

(২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রনের নীতি গ্রহণ করে থাকে ল জাতিপুঞ্জ এই ধারণায় বিশ্বাস করে যে এই দুটি ধারনার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

(৩) এই সংগঠনটি আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। বিভিন্ন প্রকারের আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরতুব অনস্বীকার্য।

(৪) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। এর ফলে বলা হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করতে এবং জাতিসমূহের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে জাতিপুঞ্জ সহায়তা করে।

জাতপুঞ্জের সনদের ১নং ধারায় যে ৪টি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার বাস্তোবায়নের সঠিক কোন বদল্যায়ন ছাড়া ঘোষিত উদ্দেশ্যের গুরুত্বকে যথাযথভাবে অণুধাবন করা সম্ভব হবে ন। এই কারনেই উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে জাতিপুঞ্জ যে ভুমিকা পালন করেছে তা আলোচনা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার যে সংকল্প সনদে ঘোষিত হয়েছে তার

টিপ্পনী

গুরত্ব সর্বজনীন এবং সর্বকালীন। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঠান্ডা যুদ্ধ এবং দ্বি-মেরুপ্রবণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে কার্য পরিচালনা করতে হয়েছে। দইমেরু প্রবন রাষ্ট্রের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এক গম্ভীর সংকটের মুখে এসে দাড়িয়েছিল। শুধু তাই নয় জাতিয় স্বার্থের আকাঙ্খা এবং জাতিয় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা জাতিপুঞ্জের প্রয়াসকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। বীশেষ ককরে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র সমূহের ভিটোও প্রদানের ক্ষমতা জাতিপুঞ্জের এই উদ্দেশ্যটিকে সফল ভাবে বাস্তোবায়নের পিছনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই আচলবস্থা দূরিকরণের লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে সাধারণ সভাকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্য প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়েছে। তদসত্বেও এই আক্রমণকে প্রতিহত করা সম্ভব পর হয়নি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বিতিয় উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে ও অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। সকল জাতির সমানাধিকার এবং অনিয়ন্ত্রনের নীতি গ্রণ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় জাতিপুঞ্জ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। নামিবিয়া , দক্ষিন আফ্রিকার ঘটনাবলী, লাতিন আমেরিকা ও মধ্য প্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশের উপর আগ্রাসন এবং সামবিক অধিকারের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য সাধনে প্রবল সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অথচ জাতিপুঞ্জের নেতৃত্বেই মানবাধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ঘোষণা গৃহীত হয়। এই কারণে অনেক সমালোচক মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক সমাজে যতদিন উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য থাকবে ততদিন সকল জাতির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রকৃত আত্মনিয়ন্ত্রনের পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সনদের ৫৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মানবজাতির সকল অংশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজন স্থিতিশীলতা এবং কল্যানমূলক একটি পরিবেশ গঠন। সকল জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব ও শান্তির ভিত্তই হবে সকলের সমানাধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি। এই কারণেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের লক্ষ্য হবে : উন্নত জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি এবং বিকাশের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। তাছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য বিষয়ক ও সংশহলিষ্ট সমস্যার

সমাধান, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সহযোগিতার প্রসার সাধনে অঙহগীকার ঘোষণা করেছে। সনদে আরো বলা হয়েছে যে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হবে জাতি, ভাষা, ধর্ম এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধা ওমর্যাদা প্রদর্শন করা। কিন্তু এ যাবৎকাল গৃহীত ব্যবস্থা সত্ত্বেও জাতিপুঞ্জ সেই আদর্শ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি।

টিপ্পনী

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গুরুত্ব সর্বজনবিছিত । তবে এই উদ্দেশ্যসাদহকে সঠিক ভাবে কার্যকর করার ব্যাপারে কয়েকটি নীতির প্রয়োজনীয়তা অণুভূত হয়। এই কারণে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ২নং ধারায় ৭টি নীতির কথার ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলি হল -

(১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য রাষ্ট্রকেই সমান রুপে গণ্য করা হয়ে থাকে।

(২) জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য রাষ্ট্রের যাতে কল্যান সাধন করা সম্ভবপর হয় সেইজন্য এই সংগঠনটির প্রত্যেকটি সদস্য তাদের ওপর যে দায়িত্বসমূহ প্রদান করা হয়েছে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কচরে।

(৩) জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলি সকল বিরোধেই শান্তিপূর্ণভাবে এবং ন্যায় নীতি অক্ষুন্য রেখেই মীমাংসা করবে।

(৪) বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন না করে জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক অক্ষুণ্য রাখার।

(৫) জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলি সর্বতোভাবে এই সংগঠনটিকে সাআয্য করবে।

(৬) আন্তর্জাতিক শান্ত ও নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রাথমিক লক্ষ্য। এই জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এ দিকেও লক্ষ্য রাখে যাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য নয়, এমন সব রাষ্ট্রও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য সনদের নির্দেশাবলি মেনে চলে।

(৭) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না ।

টিপ্পনী

জাতিপুঞ্জের সনদে সংযোজিত নীতিসমূহ একটি আদর্শ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ ও সংঘর্ষ প্রতিরোধের ভিত্তিরূপে অভিনন্দন হবার যোগ্য। কিন্তু ঐ নীতিগুলির বাস্তোবায়ন এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়-

(১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে সকল সদস্য রাষ্ট্রকেই সমান রূপে গণ্য করার নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। অনেক বীশেষজ্ঞই মনে করেন যে এই ধারনাটি একটি তত্ত্বগত ধারনা। প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শীতল যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরে এবং বৃহৎ শক্তি হিসেবে তারাই অধিষ্ঠিত থেকেছে। অথচ বলা হয় যে জাতিপুঞ্জের প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। এবং আইনগত দিক থেকে তারা নিজেদেদর অভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এমনকি জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারে। সর্বোপরি প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট দিতে ও পারে। উপরন্তু সাধারণ সভায় প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রেদর একটি করে ভোটদানের ক্ষমতার মাধ্যমে তাদের সার্বভৌম সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু শক্তিবিস্তার, মর্যাদা এবং আইনগত দিক থেকে সার্বভৌম সমানাধিকারের নীতি চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। অন্যদিকে ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগের দিকথেকে ও সার্বভৌম সমানাধিকারের নীতি চরম ভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।

(২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে উল্লিখিত প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের দায় দাবিত্ব পালনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সকল সদস্য রাষ্ট্র কতৃক সনদে আরোপিত দায় দায়িত্ব পালন বাধ্যতামূলক। সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষার জন্যই তা প্রয়োজনীয়। প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা রক্ষার জন্যই এই দায় দায়িত্ব পালন অপরিআর্য হয়ে পড়েছে। কোন সদস্যরষ্ট্র নিজের দায় দায়িত্ব পালন থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকলে তাকে সনদে স্বীকৃত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার বভবস্থা আছে। সনদে ৫নং ও ৬নং ধারায় কোন সদস্য রাষ্ট্রকে সদস্যপদ থেকে বহিস্কৃত বা বঞ্চিত করার ব্যবস্থা আছে।

(৩) সনদে সকল সদস্যরাষ্ট্রকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য

আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ন্যায়নীতিকে বজায় রেখেই এই ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সদস্যরাষ্ট্রগুলি নিজেদের অঙ্গীকার রূপায়ণে অনিচ্ছা এবং দৌদুল্যমানতা প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার অবকাশনা দিয়েই একাধি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ওপর আক্রমনাত্বক অভিসন্ধি দেখিয়েছে। যেমন ১৯৯০ - ১৯৯১ সালে নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ি সদস্যরাষ্ট্রের সম্মতি ও সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনী ইরাকের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শান্তিপূর্ণ ভাবে বিরোধ মীমাংসার নীতি অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে।

(৪) সদস্যরাষ্ট্রগুলি পরস্পরের প্রতি বলপ্রয়োগের প্রকরইয়া নিজেদের বিযুক্ত করতে পারেনি। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় শক্তি বা বল প্রয়োগ যেন গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সনদে রাষ্ট্রের অত্যন্তরীন বিষয় বলতে কি বলা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা না করার ফলে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থ অণুযায়ী কাজ করে চলেছে।

(৫) সকল সদস্যরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জেদর দ্বারা গৃহীত কার্যক্রম রূপায়নে সদইচ্ছার সঙ্গে সাহায্যে করেনি। উদাহরণ স্বরূপ অনেক বিশেজ্ঞস্য দাবী করেছেন যে, শান্তিরক্ষা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিপুঞ্জের নেতৃত্বে যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে সকল সদস্য রাৎত্র আর্থিক সাহায্যেদান এবং সেনাবহিনী পাঠিয়ে শান্তিরক্ষার প্রয়াসে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি।

(৬) সনদের ৬নং ধারায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্র যাতে আন্তর্জাতিক শান্ত ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথা বলা থয়েছে। কিন্তু ঐ সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কিভাবে সনদে সংযোজিত ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে তার কোন স্বরূপ নির্দেশ নেই। ফলে সমস্যা বেড়েই চলেছে।

উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই যে, সনদে সংযোজিত ৭টি নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক নতুন যুদ্ধের সূচনা করেছে। এখনো পর্যন্ত নীতি গুলির প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান। তবে এগুলির প্রয়োগ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সদিচ্ছা এবং শুভবুদ্ধির উপর নির্ভরশিল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ :

বিশালাকার এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি অনেকগুলি অংশে বা বিভাগে বিভক্ত। তবে এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ গুলি যথাক্রমে -

(১) সাধারণ সভা।

(২) নিরাপত্তা পরিষদ

(৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

(৪) অছি পরিষদ

(৫) আন্তজর্জাতিক বিচারালয় এবং

(৬) সচিবালয়।

১. সাধারণ সভা :

সাধারন সভাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সকল সদস্য রাষ্ট্র আছে তারা প্রত্যেকেই এই সাধারণ সভার সদস্য। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ সভায় ৫ জনের বেশি প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেন আল তবে প্রত্যেকটি সদস্য - রাষ্ট্রের একটি করে ভোট প্রদান করার অধিকার আছে। বছরে একবার করে সাধারণ সভার অধিবেশন বসে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে সাধারণ সভার ১জন সভাপতি এবং ২১ জন সহ সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। উল্লেখ কয়েকটি কমিটির দ্বারা সাধারণ সভা তার কার্যাবলী বাস্তবায়িত করে থাকে। এগুলিত মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

১. রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি

২. অর্থনৈতিক কমিটিও

৩. সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিটি

৪. অছি ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিটি

৫. প্রশাসন ও বাজেট কমিটি এবং

৬. আইনগত কমিটি।

এই কমিটিগুলি ব্যতিত বেশ কয়েকটি কমিশনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, এগুলি সাধারণ সভার অধিনে কার্য সম্পাদন করে থাকে। প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ সভার অধিবেশন বসে।

অনেক সময় সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন ও আহ্বান করা যেতে পারে, আবার প্রয়োজন মনে করলে জাতিপুঞ্জের মহাসচিব সাধারণ সভার জরুরী অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টার নোটিশ দিয়ে সাধারণ সভার এই জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা যেতে পেরে।

টিপ্পনী

সাধারণ সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাধারণ সভার হাতে কতগুলি ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের সনদের ১০ থেকে ১৭নং ধারায় সাধারণ সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষমতা এবং কার্যাবলী নীচে আলোচনা করা হল-

(১) সাধারন সভার হাতে আলোচনা ও সুপারিশ করার ক্ষমতা অপর্ণ করা হয়েছে। বিশেষত, আন্তর্জাতিক - শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত বিষয়সমূহ সাধারণ সভায় আলোচনা হয়ে থাকে। এবং সে বিষয়ে সুনিশ্চত মতামত প্রদান করে থাকে এই কারণে সাধারণ সভাকচে বিশ্ব নাগরিক সভা বলে অবিহিত করা হয়ে থাকে। তবে সাধারণ সভা কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে না। উপরন্তু আরও দুটি বিষয় বিবেচনা করে সাধারণ সভাকে তার আলোচনা ও সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। এগুলি হল -

(ক) যদি সাধারণ সভার মনে হয় যে কোনো বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন, তাহলে সেই বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে বা পরে বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পাঠাতে হয়।

(খ) যদি দেখা যায় যে এমন কোনো বিষয় নিয়ে নিরাপত্আ পরিষদে আলোচনা করা হচ্ছে, তাহলে সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি ব্যতিত সেই বিষয়ে আলোচনা করতে বা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারে না।

(২) আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, সাধারণ সভার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা

সাধারণ সভার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা। আন্তর্জাতিক আইনের উন্নতি ও প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে সাধারন সভা উৎসাহ প্রদান করে থাকে। তবে লক্ষ্যনীয় যে, সাধারণ সভা যে সকল সুপারিশ প্রদান করে থাকে, সেগুলি আইনের মতো কার্যকরী করা যায় না, সাধারণ সভাকে 'আধা-আইন সভা' রূপে অবিহিত করা হয়।

টিপ্পনী

(৩) রাজনৈতিক ক্ষমতা সাধারণ সভার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতারুপে গণ্য করা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের হাতে। এ সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয় নীয়ে আলোচনা করতে পারে । ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 'শান্তির জন্য ঐক্যের প্রস্তাব' গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটির গুরুত্ব অণস্বিকার্য । আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার বাপারে সাধারন সভার ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে এই প্রস্তাবটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে।

(৪) তত্ত্ববধান সংক্রান্ত ক্ষমতা সাধারণ সভার আরকটি গুরত্বপূর্ণ ক্ষমতা । তত্ত্ববধান সংক্রান্ত ক্ষমতা বলতে সাধারণ সভার পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ ও সচিবালয়কে তাদের কার্যাবলী সংক্রান্ত বিবরণ সভার কাছে পেশ করতে হয়, এভাবে সাধারন সভা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য অঙ্গ সমূহের ওপর তদারকি বা তত্ত্ববধানের কার্য সম্পাদন করে থাকে।

(৫) সাধারণ সভার কিছু অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতাও আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাধারণ সভা দ্বারা নিয়ন্ত্রিক থতে থাকে। জাতিপুঞ্জের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করার এক বভায় অনুমোদন করার ক্ষমতা সাধারণ সভার হাতেই অর্পণ করা হয়েছে।

(৬) সাধারণ সভার হাতে নির্বাচনমূলক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে । জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন করার ব্যবস্থা করে থাকে সাধারণ সভা । এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য এবং অছি পরিষদের কয়েকজন সদস্যকে নির্বান করে থাকে সাধারণ সভা । এছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা আরও কয়েকজন

সদস্যদের নির্বাচিত করে থাকে। এঁরা হলেন - মহাসচিব, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিগণ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নতুন সদস্যগণ।

(৭) সাংবিধানিক ক্ষমতা হল সাধারণ সভার আরেকটি অনন্য ক্ষমতা, সাংবিধানিক ক্ষমতা বলতে বোঝায় সাধারণ সভার সনদ সংশোধনের ক্ষমতা। সাধারণ সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই - তৃতীয়াংশের সম্মতি ছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি অনুযায়ি গ্রহণ করা কোনো সনদ সংশোধ করার প্রস্তাব বাস্তবায়িত করা যায় না।

টিপ্পনী

সাধারণ সভার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই গুরুত্বকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না। যদিও এর কার্যাবলীর কোনো আইনগত মুল্যনেই, তবুও জাতিপুঞ্জের এই অঙ্গটির গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। এটি জাতিপুঞ্জের বৃহত্তম সংস্থা। এই সভায় জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য স্থান গ্রহন করতে পারে এবং সকলের সমান অধিকার আছে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিদ্বির্ধায় সাধারণ সভায় তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে।

বর্তমান নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, সাধারণ সভার গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ অনেক সময় ঐক্যমত্যে উপনীত হতে পারেনি। এই কারণে ১৯৫০ সালে ঐক্যের জন্য শান্তির প্রস্তাব - এর মাধ্যমে সাধারণ সভার হাতে এই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। পরবর্তীকালে সাধারণ সভা এই বিষয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশী একথাও ঠিক যে কোনো কোনো বৃহৎ শক্তির অঙ্গুলিহেলনে শান্তি নিরাপত্তা রক্ষায় যুদ্ধহীন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাধারণ সভা অনেকসময় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, যেমন ১৯৯০ - ৯১ সালে ইরাকের উপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনীরর আক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ সভা কোনো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহন করতে পারনি। অনেক বিশেষজ্ঞ এমনও মত পোষণ করেছেন ঠান্ডা যুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য সাধারণ সভার ক্ষমতাকে খর্ব করে।

নিরাপত্তা পরিষদ :

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান অঙ্গ হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল ১৯৪৪ সালে জম্বারটন ওকস সম্মেলনে যেখানে বিশ্বশান্তি ও

টিপ্পনী

নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য একটি প্রশাসনিক সংগঠন গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়েছিল। তারই বাস্তব রূপ হল নিরাপত্তা পরিষদ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্বন্ধে ২৩ নং ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের হাতে। বিশ্বব্যাপী এই কার্য সাধনের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদ নিজেদের সদস্য সংখ্যাকে দুইভাগে ভাগ করেছে। এক- স্থায়ী সদস্য এবং দুই আস্থাবি সদস্য। পাঁচ স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হল - ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চিন। অন্যদিকে সাধারণ সভা দুই বছরের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের দশ জন অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত করে থাকে। এদের মধ্যে পাঁচজন সদস্য রাশিয়া ও আফ্রিকা থেকে একজন সদস্য পূর্ব ইউরোপ থেকে, দুই জন সদস্য লাতিন আমেরিকা থেকে এবং দুই জন সদস্য পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ ধেকে নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। তবে পাঁচ স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের একমাত্র ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

নিরাপত্তা হল সম্মিলিত জাতপুঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক এবং অদ্বিতয়। যাইহোক নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি শ্রেনীতে ভাগ করা যেতে পারে -

(১) বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা

(২) অছি সংক্রান্ত ক্ষমতা

(৩) নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা

(৪) বহিস্কার সংক্রান্ত ক্ষমতা

(৫) সনদ সংশোধনের ক্ষমতা

(৬) নিরস্ত্রিকরণ সম্পর্কিত ক্ষমতা

প্রথমত :

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা নিরাপত্তা পরিষষদের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দিলে নিরাপত্তা পরিষদ

বিবাদমান রাষ্ট্রসমূহকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তইর অনুরোধ জানাতে পারে। সনদের ৩ নং ১ ধারায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিস্পত্তির সাটটি পদ্ধতির উল্লেখ আছে - (ক) আলাপ আলোচনা (খ) অনুসন্ধান (গ) মধ্যস্থতা (ঘ) সালিশী (ঙ) বিচারের নিষ্পত্তি (চ) আঞ্চলিক সংস্থা (ছ) অন্য কোন শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন - এগুলির সাহায্যে বিরোধ নিরসনেদর চেষ্টা করতে পারে।

টিপ্পনী

দ্বিতীয়ত :

জাতিপুঞ্জের সনদে নিরাপত্তা পরিষদকে অছি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ব্যস্ত করা হয়েছে। সনদেদর ৮৩ নং ধারা অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ অছি সংক্রান্ত সকল চুক্তির শর্তাবলী অনুমোদন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধন করতে পারে। এই সকল কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্য স্বাভাবিভাবেই অছি পরিষদের সদস্যপদ অর্জন করে। ফলে অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত এবং সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা - সংস্কৃতি বিষয়ক জাতিপুঞ্জের দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

তৃতীয়ত :

নিরাপত্তা পরিষদের হাতে নিয়োগ সংক্রান্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা মহাসচিবকে নির্বাচিত করে। এই সুপারিশের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ি সদস্যসহ নয়জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। এছাড়া আন্তর্জাতিক বিচারলয়ের বিচারপতিদের নির্বাচন ও জাতিপুঞ্জের নতুন সদস্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ও নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে পাঁচজন স্থায়ি সদস্যসহ নয়জন সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন।

চতুর্থত :

নিরাপত্তা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ এক্তিয়ার হল কোন রাষ্ট্রের সদস্যপদ বাতিল ও বহিস্কার। শান্তিভঙ্গকারী বা আগ্রাসী কোন সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ পরিষদ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করলে সেই সদস্যরাষ্ট্রকে সাময়িককালের জন্য তার অধিকার ও সুবিধাভোগ থেকে বঞ্চিত করা যায়। তবে সাময়িকভাবে কোন রাষ্ট্রের

সদস্যপদ বাতিলের জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে সাধারণসভার নিকট সুপারিশ পেশ করতে হয়। অন্যদিকে কোন সদস্যরাষ্ট্র যদি বারবার সনদে সংযোজিত নীতিসমূহ লঙ্ঘন করে তবে সেই রাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জ থেকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সাধরণ সভার নিকট সুপারিশ করতে পারে।

টিপ্পনী

পঞ্চমত :

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ সংশোধনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। সনদের ১০৮ নং ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদেই সনদের কোন অংশের সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে। তবে সংশোধনের প্রস্তাবসমূহ নিরাপত্তা পরিষদের সকল স্থায়ী সদস্যের সম্মতিক্রমে সাধারনসভার নিকট পেশ করতে হয় এবং সাধারণ সভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন ললাভ করলে প্রস্তাব কার্যকরী হয়।

ষষ্ঠত :

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য অত্যাবশ্যক হল নিরস্ত্রীকরণ। এই কারণে সনদে উল্লেখ করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক শান্ত ও নিরাপত্তারক্ষার জন্য এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পদ যাতে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত না হয় সে দিকে নিরাপত্তা পরিষদ লক্ষ্য রাখবে।সর্বোপরি শান্তিরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যাবলী নিরাপত্তা পরিষদ সম্পাদিত করবে।

যাইহোক অনেক আশা নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রূপে নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু আশা - ভরসা সম্মলিত এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটির কথা ও কাজের মধ্যে অনেক সময় বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা গেছে। যেহেতু দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই এই আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়েও তোলা হয়েছিল এবং তারপর আর কোন বিশ্বব্যপী সংঘাতের সূত্রপাত হয়নি সেই কারণে ইউরোপের পূর্ণ দখলকে কেন্দ্র করে যে ঠান্ডা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। যা দুদশকের ও বেশী সঞ্চয় স্থায়ি হয়েছিল সেই কারণে দুটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ তার কার্যাবলী সম্পাদন করেছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ :

এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে সনদের রচয়িতাগণ বিশেষ ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ঠিকই কিন্তু সমগ্র বিশ্ব মানবের মধ্যে সামজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে না পরলে বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। এই উপলব্ধিই এই পরিষদ গঠনের মুখ্য হয়ে উঠেছিল।

টিপ্পনী

ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

জাতিপুঞ্জের সনদের ৬২ নং থেকে ৬৬ নং ধারায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য ক্ষমতা ও কার্যাবলী গুলি নীচে আলোচনা করা হল -

(১) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য বিষয়ে সমীক্ষা করে এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

(২) সমস্ত মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধীনতার প্রতি যাতে সম্মান প্রদর্শণ করা হয় সেই উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে নির্দেশ প্রদান করে।

(৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিজেদর ক্ষমতাধিণ বিষয় সম্পর্কে খসড়া করে এষবং সেটি সাধারণ সভার নিকট পেশ করে থাকে।

(৪) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনস্থ যে সকল বিশেষজ্ঞ সংস্থা গুলি আছে তাদের গঠন ও কাযর্যাবলীর সমন্বয় সাধন করে থাকে।

(৫) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নিরাপত্তা পরিষদকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা ও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা। সর্বোপরি, সাধারণ সভা অনেক সময় প্রয়োজণীয় কিছূ দায়িত্ব অর্পন করে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজ হল সেগুলি সঠিকভাবে পালন করা।

(৬) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিজেদের কার্যাবলীকে সঠিকভাবে সম্পাদন করতে কতগুলি কমিটি বা কমিশন গঠন করে থাকে যেমন - পরিসংখ্যা বিষয়ক কমিশন, জনসংখ্যা বিষয়ক কমিশনে, সামাজিক বিকাশ সম্পর্কিত কমিশন

মানবিক অধিকার সংক্রান্ত কমিশন, অপরাধ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিশন ইত্যাদি।

একথা ঠিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সাধারণসভা বা নিরাপত্তা পরিষদের মতো কোন রাজনৈতিক মদত নয়। তাই এই পরিষদ ব্যাপক ও বহুমুখী কার্য সম্পাদন করে থাকে। যেমন পরিসংখ্যান, জনসংখ্যা, সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার, সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য দূরিকরণ, মাদক দ্রব্য প্রতিরোধ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পরিষদ শুধু সমস্যা পর্যালোচনা ও করে না সমাধানের রাস্তা ও বাতলে দেয়। যাইহোক এই গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সীমাবদ্ধতা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় -

(১) এই পরিষদের হাতে কার্যকিরী ক্ষমতা প্রদান না করায় সংস্থাটির কার্যাবলী কেবলমাত্র আলাপ - আলোচনা, খসড়া প্রণয়ন এবং সুপারিশ প্রদানেদর মধ্যেই সীমতি থেকেছে।

(২) সাধারণ সভার নেতৃত্বাধীনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ তার কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে ফলনে এটি সাধারণ সভার একটি অধস্তন সংস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। সর্বোপরি অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষ সংস্থা ও বিশেষ সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ।

এসকল দুর্বলতা সত্ত্বেও বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রেখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবিক বোধেদর বিকাশকে ত্বরান্বিত করছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিন দশক ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সঙ্গে যুক্ত সংস্থার সংখ্যা বেড়েই চলেছে এর ফলে অনেক মৌলিক দাবি পূরণের পথ প্রশস্ত হয়েছে। যেমন -

(১) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা

(২) আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন

(৩) কৃষি বিকাশের জন্য আন্তর্জতিক অর্থভান্ডার

৪. আন্তর্জাতিক সাম্দ্রিক গঠন

(৫) আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন

টিপ্পনী

(৬) শিল্প উন্নয়ন সংস্থা

(৭) বিশ্ব বৌদ্ধিক সম্পত্তি সংস্থা

(৮) বিশ্ব আবহবিদ্যা বিষয়ক সংস্থা

(৯) আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি এজেন্সি এই সমস্ত সংস্থা সমূহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রেখে চলেছে।

টিপ্পনী

অছি পরিষদ :

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের একটি অত্যন্ত আকর্ষনীয় অংশ হল স্বায়ত্তশাসনহীন অঞ্চল সম্পর্কিত ঘোষণা অছি ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শাসনাধীন নির্যাতিত মানুষের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত করেছে। সনদের দ্বাদশ অধ্যায়ে ৭৫ থেকে ৮৫ নং ধারায় আন্তর্জাতিক অছী ব্যবস্থা এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৮৬ থেকে ৯১ নং ধারায় উল্লেখ আছে।

১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ গৃহীত হওয়ার সময়ে এটা অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছিল লাভের উপযুক্ত হয়ে ওঠতে সক্ষম হয়নি ; তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার প্রয়াস গৃহীত হয়। যাতে করে মানুষগুলি স্বনির্ভরবতায় বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণে থেকে স্বাধীনতা লাভের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে; সেই ব্যবস্থা করবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। ফলে যখন এরা স্বাধীনতা লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তখন এদের স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থাকেই অছি ব্যবস্থা হিসেবে অবিহিত হয়ে থাকে।

গঠন :

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি অন্যতম প্রধান সংস্থা রূপে অছি পরিষদকে গণ্য করা হবে থাকে। অছি ব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য অছি পরিষদকে গঠন করা হয়েছে।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

(১) অছি অঞ্চলগুলির প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। এই প্রতিবেদনগুলি বিচার বিবেচনা করে দেখার দায়িত্ব করা হয়েছে অছি পরিষদের

হাতে।

(২) অছি অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের অভাব - অভিযোগ ও দাবিদাওয়া জানাতে পারে। তারা এই সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট আবেদন অছি পরিষদের কাছে পেশ করতে পারে। অছি পরিষদ এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অছি অঞ্চলের প্রশাসনিক কতৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এরপর পরিষদ তা বিবেচনা করে দেখে।

টিপ্পনী

(৩) অছি এলাকার শাসনব্যবস্থা পরিদর্শন করার জন্য ওই অঞ্চলে অছি পরিষদ পরিদর্শক পাঠাতে পারে। তবে এর পূর্বে অছি পরিষদকে ওই অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষেদর সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হয়।

(৪) অছি অঞ্চলে বসবাসকারি অধিবাসীদের বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি পরিমাপ করার জন্য অছি পরিষদ একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে।এই প্রশ্নমালাটি অছি পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠায়। ওই প্রশ্নমালাটির উত্তরের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি অছি অঞ্চলনের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সাধারণ সভার নিকট একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করে।

যাইহোক ১৯৪৬ সালে গঠিত জাতিপুঞ্জের এই অঙ্গটি সমগ্র বিশ্ব আত্মনিয়ন্ত্রণেদর অধিকারটি কার্যকরী করার জন্য অছি পরিষদ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এই জন্য দেখা যায় যে, বর্তমানে অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌম।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়:

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠনের সময় আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায় বিকাশের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য লীগ আমলে স্থায়ি আন্তর্জাতিক আদালতের উত্তরসূরী হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠন পরিহার্য - এই ধারনা থেকেই গঠিত হয় আন্তর্জাতিক বিচারালয়। এটি নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত। জেনে রাখা দরকার আন্তর্জাতিক বিচারলয়ের একটি আলাদা সংবিধান আছে যা 'সৎবিধি' নামে পরিচিত। এই সংবিধানের ৩নং ধারা অনুসারে ১৫ জন বিচারপতি নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত। বিচারালয়ের বিচারপতিরা ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তবে ৩ বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্যদের অবসর গ্রহণ করতে হয়।

কার্যাবলী :

(১) আন্তর্জাতিক বিচারলয়ের কাছে বিবাদমান রাষ্ট্রগুলি যদি কোন মামলা আনতে চায় তবে এই বিচারলয়ের কাছ থেকে সম্মতি নিতে হয়। তবে এই সমস্ত মামলা বিচারালয়ের স্বেচ্ছামূলক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে কোন রাষ্ট্রই মামলা দায়ের করার ব্যাপারে বাধ্য নয় এই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছে ; তবে একবার মামলা পেশ করলে বিবাদমান রাষ্ট্রকে বিচারালয়ের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হবে।

(২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের অন্তর্ভুক্ত সব বিষয় এবং বলবৎ হয়েছে এমন সন্ধি বা চুক্তিপত্রের বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয় তার মতামত জানাতে পারে। তা ছাড়া বর্তমান সংবিধির সদস্যরা যেকোন সময় ঘোষনা করতে পারেন যে, তারা বিশেষ চুক্তি ব্যাতিত এমন কোন বিবাদ যেকানে আইন সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত আছে। সেই সব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নেবেন।

উপরিউক্ত কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদন করতে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধি এক্তিয়ারকে তিন ভাগে ভাগ করে তার কার্যবিধি করে থাকে - (১) স্বেচ্ছাধীন (২) আবশ্যিক (৩) উপদেশক বা পরামর্শমূলক

সচিবালয় ও মহাসচিব :

সনদের ৯৭নং ধারায় সচিবালয়ের গঠন সম্পর্কে উল্লেখ আছে। ঐ ধারা অনুসারে মহাসচিব এবং জাতিপুঞ্জের প্রয়োজণীয় অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ে সচিবালয় গঠিত। মহাসচিব হলেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান প্রশাসনিক কর্মচারী। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে তিনি সাধারণ সভা কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাছাড়া মহাসচিবকে সাহায্য করার জন্য বর্তমানে কিছু সংখ্যক উপ-মহাসচিব এবং কিছু সহকারী মহাসচিব থাকেন। এছাড়া ও থাকেন কিছু সংখ্যক কর্মচারি - এদের নিয়েই গড়ে উঠেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই আমলাতান্ত্রিক কাঠামোটি।

সচিবালয়ের কার্যাবলী ও ক্ষমতা :

(১) সচিবালয়ের জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ যথা -সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়

টিপ্পনী

সংক্রান্ত আইনগত কার্যবিধি সম্পর্কিত দলিল প্রনয়ন করে থাকে। এছাড়া এই সংক্রান্ত বিষয় গুলি সংরক্ষণের জাতিয় দাবিত্ব সচিবালয়ের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। উপরন্তু, সাধারণ সভার অধিবেশনের দৈনন্দিন কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করে পচরকাশের দায়িত্ব সচিবালয়ের হাতে রয়েছে।

টিপ্পনী

(২) সচিবালয়কে সমন্বয় সাধন দায়িত্ব ও পালন করতে হয়। সচিবালয় নিউ ইয়র্ক এ অবস্থিত সদর দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের মধ্যে সহযোগিতা ও মতবিনিময় করে থাকে । বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সচিবালয়ের দপ্তর থাকে এবং সচিবালয়ে এই দপ্তর গুলি পরিচালনা করে থাকে।

(৩) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অঙ্গগুলি তাদেদর কার্যসমূহ নির্বাহ বভাপারে কীছু তথ্য ও পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা অণুভব করে । সর্বোপরি সচিবালয়ের কিছু শাসন বিভাগীয় কার্যাবলির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। যদি ও এই শাসন বিভাগীয় কার্যাবাই অত্যন্ত সীমিত।

মহাসচিব এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

মহাসচিব হলেন জাতিপুঞ্জের মখ্য প্রশাসক । সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সচিবালয়ের কাঠামো নির্ধারণ এবং তার কর্মচারীদের নিয়োগ ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্মচারীদের নীবোগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেন উপযুক্ত সুযোগ পায় সে দিকে মহাসচিবকে লক্ষ্য রাখতে হবে। উপরন্তু তাঁকে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ এবং অছিপরিষদের প্রধান প্রশাসনিক অফিসার রূপেও বৈজ্ঞানিক বিষয় সহ অন্যান্য কার্যাবলির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। যাইহোক সনদেদর ১২ (২), ৯৮, ৯৯, ১০০ এবং ১০১ নং ধারায় মহাসচিবের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি দায়িত্ব গুলি তুলে ধরা হল - (১) নিবোগ সংক্রান্ত ক্ষমতা (২) মুখ্য প্রশাসক হিসেবে তাঁর ক্ষমতা (৩) সভায় অংশ গ্রহন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও বিশেষ প্রকৃতি সংক্রান্ত (৪) অর্থবিষয়ক ক্ষমতা (৫) জাতিপুঞ্জের মুখপাত্র হিসেবে তার ক্ষমতা (৬) সর্বোপরি রাজনৈতিক ক্ষমতা ও (৭) আন্তর্জাতিক বিচারলয় সংক্রান্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

পরিশেষে একথা ঠিক যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে তিনি বহু ও বিবিধ ভূমিকা পালন করে থাকেন। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক

রাজণিতি ও তিনি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতা তাঁকে অভ্যন্তরনীয় কর্তৃত্ব প্রদান করেছে।

সার্ক (SAARC) :

টিপ্পনী

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সংক্ষেপে সার্ক) দক্ষিণ এশিয়ার একটি সরকারি সংস্থা। এর সদস্য দেশগুলো বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান এবং আফগানিস্তান। গণচীন ও জাপানকে সার্কের পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। সার্ক ১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর প্রতিষ্টিত হয়েছিল। যখন বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান নেপাল ভুটান মালদ্বীপ ও শ্রীলংকা নেতারা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক,অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতা করার লক্ষে এক রাজোকীয় সনদপত্রে আবদ্ধ হন। এটি অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং উন্নয়নের যৌথ আত্মনির্ভরশীলতা জোর নিবেদিত। সার্কের প্রতিষ্টাতা সদস্য সমূহ হল বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান এবং ২০০৭ সালে আফগানিস্তান সার্ককের সদস্য পদ লাভ করে। রাষ্ট্রের শীর্ষ মিটিং সাধারণত বাৎসরিক নির্ধারিত এবং পররাষ্ট্র সচিবদের সভা দুই বছর পর পর অনুষ্টিত হয় । নেপালের কাঠমান্ডুতে সার্কের সদর দফতর অবস্থিত।

সার্ক এর লক্ষ্য এবং নীতি সমূহ :

সার্ক এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে ডিসেম্বর মাসে ঢাকা শহরে। এই সম্মেলনে সার্ক এদর গৃহীত সনদে সার্ক এদর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং নীতিসমূহ উল্লেখ করা হয়। এগুলি ল -

(১) দক্ষিন এশিয়ার জনগণের কল্যান ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

(২) এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য ও আত্মবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(৪) পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে একে অন্যের সমস্যা উপব্ধি

টিপ্পনী

করা।

(৫) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংসকৃতিক, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করা।

(৬) অন্যান্য উন্নয়নশিল দেশের সঙ্গে সহযোগিতা সুদূর করা।

(৭) আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মঞ্চে দক্ষিণ এশিয়ার স্বার্থ সুরক্ষার জন্য নিজেদের মধ্যে পারস্পররিক সহযোগিতা।

(৮) আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন ও আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

সার্ক এর এসব উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ব্যাতীত সার্ক এর সনদে এই সংগঠনেদর কতকগুলি নীতির বিষয় ও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে এসব নীতির প্রতি সার্ক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে। এগুলি হল -

(১) সার্ক এর মধ্যেকার সহযোগিতা সার্বভৌম সাম্য, ভূখন্ডগত অখন্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক সুবিধা।

(২) এরূপ সহযোগিতা দ্বিপাক্ষিক অথবা বহু পাক্ষিক স্যোগিতাকে সাহায্য করবে।

(৩) এরূপ সহযোগিতা সদস্য রাষ্ট্রগুলির দ্বিপাক্ষিক এবং বহু পার্শ্বিক দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করবে।

(৪) ঐক্যমত্যের ওপর ভিত্তি করে সার্কের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

(৫) দ্বিপাক্ষিক এবং বিরোধপূর্ণ ঘটনাসমূহ আলাপ আলোচনার বাইরে রাখা হবে।

১৯৮৭ সালের ১৬ জানুয়ারী কাঠমান্ডুতে সার্ক এর সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইই সচিবালয়ের প্রধান হলেন একজন মহাসচিব। সদস্য রাষ্ট্রগুলির মন্ত্রিসভা এই মহাসচিবকে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করেন। সচিবালয়ের কাজ হল -

(১) সার্ক এর কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন এবং তত্ত্বাবধান করা।

(২) সার্ক এর মিটিং এর প্রস্তুতি গ্রহন করা।

(৩) সংগঠন এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং তৎসহ অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করা।

টিপ্পনী

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন :

১ম	৭-৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫	বাংলাদেশ	ঢাকা
২য়	১৬-১৭ নভেম্বর, ১৯৮৬	ভারত	ব্যাঙ্গালোর
৩য়	২-৪ নভেম্বর, ১৯৮৭	নেপাল	কাঠমণ্ডু
৪র্থ	২৯-৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮৮	পাকিস্তান	ইসলামাবাদ
৫ম	২১-২৩ নভেম্বর, ১৯৯০	মালদ্বীপ	মালে
৬ষ্ঠ	২১ ডিসেম্বর, ১৯৯১	শ্রীলঙ্কা	কলম্বো
৭ম	১০-১১ এপ্রিল, ১৯৯৩	বাংলাদেশ	ঢাকা
৮ম	২-৪ মে, ১৯৯৫	ভারত	নয়াদিল্লি
৯ম	১২-১৪ মে, ১৯৯৭	মালদ্বীপ	মালে
১০ম	২৯-৩১ জুলাই, ১৯৯৮	শ্রীলঙ্কা	কলম্বো
১১'শ	৪-৬ জানুয়ারি, ২০০২	নেপাল	কাঠমণ্ডু
১২'শ	২-৬ জানুয়ারি, ২০০৪	পাকিস্তান	ইসলামাবাদ
১৩'শ	১২-১৩ নভেম্বর, ২০০৫	বাংলাদেশ	ঢাকা
১৪'শ	৩-৪ এপ্রিল, ২০০৭	ভারত	নয়াদিল্লি
১৫'শ	১-৩ আগস্ট, ২০০৮	শ্রীলঙ্কা	কলম্বো
১৬'শ	২৮-২৯ এপ্রিল, ২০১০	ভুটান	থিম্ফু
১৭'শ	১০-১১ নভেম্বর, ২০১১	মালদ্বীপ	আদ্দু

সার্কের বিভিন্ন কার্যাবলী :

১৯৮৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সার্ক বহুবিধ কার্য সাধন করেছে। এদের মধ্যে

টিপ্পনী

গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী গুলি যথাক্রমে -

(১) কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, পরিবেশ আবহাওয়া এবং বনজ সম্পদ; বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি; মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং শক্তি - এইসব বিষয়ে উন্নয়ন সাধনের জন্য সার্ক একটি কার্যক্রম চালু করেছে যা SAARC Integrated Programme of Action (SIPA) নামে খ্যাত।

(২) সার্ক অনেকগুলি চুক্তি ও সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে - এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল খাদ্য নিরাপত্তার জন্য স্বাক্ষরিওত চুক্তি, সন্ত্রাস দমন করার জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি, মাদক দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাক্ষরিত চুক্তি, মহিলা এবং শিশুদের পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত স্বাক্ষরিত চুক্তি ; দক্ষিন এশিয়ার শিশু কল্যানের জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি, দক্ষিন এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা পত্র।

(৩) সার্ক কতকগুলি কার্যক্রম গ্রহন করেছে এগুলি হল - দারিদ্র দূরীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, স্যাপটা থেকে স্যাফটা গঠনের বিষয়ে ঐক্যমত্যে উপনীত হওয়া,সার্ক উন্নয়ন তহবিল প্রতিষ্ঠা করা।

যাইহোক দক্ষিন এশিয়ার আঞ্চোলিক সংগঠন হিসেবে সার্কের গুরুত্ব কে অস্বীকার করা যায় না। ইতিমধ্যেই আঞ্চলিক সংগঠনটি কতগুলি পদক্ষেপ বাস্তবায়িত করেছে - অনেকগুলি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান হয়েছে এবং সেগুলি নির্ধারিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে।

ওপেক (OPEC) :

আঞ্চলিক সংগঠন গুলির মথ্যে ওপেক হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। একে আন্তঃসরকারি সংগঠন ও বলা হয়ে থাকে। আন্তঃসরকারি সংগঠন বলা হয় এই কারণে যে আরবের কয়েকটি পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারি রাষ্ট্রের সরকার একত্রিত হয়ে এই সংগঠনটি তৈরি করেছিল। ১৯৬০ সালে পাঁচটি তেল উৎপাদনকারী দেশ একত্রিত হয়ে ওপেক গঠন করে। এরা হল - ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদি আরব এবং ভেনে জুয়েলা। পরে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৬ সাল থেকে ওপেক এর প্রধান কার্যালয় ভিয়েনাতে অবস্থিত। ২০০৮ সালে ইন্দোনেশিয়া ওপেকের সদস্যপদ ত্যাগ করে।

ওপেক কেন গঠিত হয়েছিল ? -

হঠাৎ করে সাময়িক উত্তেজনা বশে কয়েকটি পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশ ওপেক গঠন করেনি।অনেক ভাবনাচিন্তা এবং বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটেই বাধ্য করেছিল এই ধরনের সংগঠন গড়ে তুলতে -

টিপ্পনী

(১) বিশ শতকের পাচের দশকে তেলের ভাম ভীষণভাবে নেমে যাওয়ায় তেল উৎপাদক আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে। কারণ আরবেদর দেশগুলির রাজস্বেদর একমাত্র উৎস হল এই তেল। সেই তেলের দাম কমে যাওয়ায় আর্থিক সংকটেদর মুখে তারা পড়ে এবং তা কাটিয়ে ওঠার জন্য পন্থটা পদ্ধতি খোঁজ করতে শুরু করে দেয় যার ফলশ্রুতিত হল এই ওপেক।

(২) তেলের উৎস আরবের দেশগুলি হলে ও এর উৎপাদন, শোধন ও বিপনন প্রভৃতি ও প্রক্রিয়া নীয়ন্ত্রণ করতো ইউরোপের দেশগুলি বিশেষ করে ব্রিটেন। কার্যত এইসব কাজে আরবের দেশগুলির ভূমিকাই ছিল না। যেমন ১৯৫১ সালে ইরান ব্রিটেন নিয়ন্ত্রিত তেল কোম্পানীগুলি জাতিয়করণ করার উদ্যোগ নেয়। পুঁজিবাদি দেশগুলির কূটনৈতিক ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে সে উদ্দেশ্য সকল হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে ওপেক।

(৩) যে সমস্ত দেশ তেলের মজুত ভান্ডার নামে খ্যাতি অর্জন করেছিল তারা দেখল যে অল্প কয়েকটি দেশ তেল সম্পদ সমৃদ্ধ। আর তাদের তেলের ওপর নির্ভর করে বিশ্বের দেশগুলি সমৃদ্ধশালী হচ্ছে ও একইসঙ্গে বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে যেহেতু তেল উৎপাদকরা সম্পদ ও সমৃদ্ধির মুখ্য উৎস, রাজনীতির ওপর তাদের একটা নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওপেক গঠন করে।

(৪) তেল হল আরবের দেশগুলির রাজস্বের একমাত্র উৎস সে কারণে তেল বিক্রি থেকে সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব অর্জন করে নিজেদের অর্থনীতিক বিকাশকে সুসংহত ও দ্রুত করে তোলা যাবে, সেই উদ্দেশ্যে ওপেক।

ওপেকের প্রনালী থেকে সংগঠনটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে জানা যায় -

(১) ব্যাক্তিগত ও যৌথভাবে সংগঠনের স্বার্থরক্ষা রক্ষার জন্য সবচেয়ে ভালো পন্থা নির্ধারণ করা।

টিপ্পনী

(২) তেলের দামের ক্ষতিকারক এবং অহেতুক ওঠাপড়া রোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

(৩) তেল উৎপাদনকারী কোম্পানীর স্বার্থসব সময় বিবেচনা করা।

(৪) তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি যাতে সুষম আয় অর্জনে সক্ষম হয় সেদিকে নজর রাখা।

(৫) তেল ব্যবআরকারী দেশগুলি যাতে দক্ষভাবে এবং নিয়মিতভাবে খনিজ তেল শিল্পে অর্থ লগ্নি করেছে তারা যেন তাদের বিনিয়োজিত পুঁজির ওপর ন্যায়ে ফেরত পেতে সক্ষম হয় সেদিকে লক্ষ রাখা।

আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার :

১৯৪৪ সালে ২২ জুলাই ব্রেটন ওডস সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার নামক আন্তর্জাতিক সংগঠনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৫ সালে ২৭ ডিসেম্বর ২৯ টি দেশ এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার পর আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার নামক আন্তর্জাতিক সংগঠনটি তার কার্যকলাপ শুরু করে। শুরুর পর্যায়ে সংস্থাটি যখন কাজ শুরু করে তখন এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৫ । বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৮৯ । এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি সি তে অবস্থিত।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি বা অর্থব্যবস্থা এত বেশি পরিমাণে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল যে কোনো একটি দেশ নিজের ইচ্ছানুযায়ী অর্থ সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করতে আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার গঠনের উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। বিশেষ করে দ্বিতিয় বীশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা আনা এবং বিশ্বের আন্তর্জাতিক প্রদান ব্যবস্থার পুনঃগঠনের সহায়তা করা ছিল আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ দ্বিতিয় বীশ্বযুদ্ধের পর অনেক দেশ প্রধানত রাজনৈতিক কারণে এমন সব অর্থনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আরম্ভ করল যেগুলি অর্থশাস্ত্রের বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন পণ্যের উৎপাদন কমানো, বাড়ানো, ইচ্ছামত শুল্কনীতি নর্ধারণ করা ইত্যাদি বিষয় আন্তর্জাতিক অর্থনীতির রাজ আলগা হয়ে গিয়েছিল; স্বাভাবিক ভাবে এই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের পথ ত্বরান্বিত করেছিল।

আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার বেশ কতগুলি দিকে দৃষ্টি রাখে। যেমন -

(১) আগেই বলা হয়েছে পণ্যের উৎপাদন কমানো বাড়ানো এবং শুল্কনীতি নির্ধারণ করা এবং এর নেতিবাচক প্রভাব যাতে অন্যদেশের অর্থনীতির ওপর না পড়া সেই সব বিষয়ে গবেষণা এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখা আই. এম. এফ এর কাজ।

টিপ্পনী

(২) এক দেশের বাজারে মন্দা দেখাদিলে তার প্রভাব অন্য দেশের উপর পড়বে এবং সেখান থেকে ভাইরাসের মতো অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়বে - পড়াটা স্বাভাবিক ও তার প্রমাণ মার্কিন অর্থনীতির মন্দা। আবার অন্যদিকে একটি দেশ তার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করে তোলার জন্য এমন সব কৌশল প্রয়োগে ব্যস্ত হল যা অন্যদেশের সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল; তাই এম এফ এই কারণে মনে করে যে, যে কোনো দেশ যখন অর্থনীতি সংক্রান্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চলেছে তাকে দেখতে হবে যে ঐপদক্ষেপএর মধ্যে যুক্তিসিদ্ধতা পুরোমাত্রায় আছে কিনা। সংগঠনটি সে দিকে সুচতুর দৃষ্টি রাখে।

(৩) আই. এম. এফ মনে করে বিশ্বের নানা দেশের অর্থনীতি এমনভাবে সক্রিয়তা প্রদর্শন করে যে সব কিছুর মধ্যে যৌথ স্বার্থ ধারনা কাজ করে চলেছে। এই যৌথ স্বার্থ ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে কয়েকটি বিশ্ব অর্থসংস্থা। এদের একত্রিত নেতৃত্ব দিতে চাইছে এই আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার।

অতএব আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার সেই সংগঠন হিসেবে অবিহিত করা যেতে পারে যা সদস্যসমূহের আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক সহযোগিতা আনয়ন, আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রক্রিয়ার সহজসাধ্যকরণ, উচ্চতর পর্যায়ের নিয়োগকরণে সাহায্য অর্থনীতিক উন্নয়ন সাধন এবং দারিদ্র্য হ্রাস করার ব্যাপারে কাজ করে থাকে।

সাংগঠনিক কাঠামো :

আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের সাংগঠনিককাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এর পরিচালকমন্ডলীর এটি পরিচালক পরিষদ আছে। যে পরিষদ বছরে একবার মিলিত হয়। এই পরিষদই কার্যকরী পরিচালকদের নির্বাচিত করে থাকে। ২৪ জন কার্যকরী পরিচালকদের নিয়ে কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়। ১৮৯ টি সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে

প্রতিনিধিত্ব করে এই কার্যকরী পরিষদ। আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের নেতৃত্ব প্রদান করেন একজন নিয়ন্ত্রণকারী পরিচালক এবং তিনিই সভাপতি হিসাবে কার্য সম্পাদন করে থাকেন। আবার তাকে সাহায্য করার জন্য ৪ জন উপনিয়ন্ত্রণকারী পরিচালক থাকেন।

টিপ্পনী

এই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যা গোটা বিশ্বের বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ামক তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার বিষয়। কিন্তু সংগঠনটির ভূমিকা, বীশেষ করে বিশ্বঅর্থনীতিতে এর ভূমিকা কোনো ভাবেই সমালোচনার উর্দ্ধেনয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে বৃহৎশক্তিগুলির নেতৃত্বে সংগঠনটি কাজ করে চলেছে। বিশ্ব অর্থনীতি যে কেবল মুষ্টিমেয় বৃৎরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় না এবং এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা ও করা যায় না তা এই সংবিধানটি বর্তমানে ভুলতে বসেছে। বীশেষকরে যেসব দেশে নীতি সংস্কারে প্রয়োজনীয়তা আছে সেইসব দেশের আম্চলিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতক অর্থভান্ডার ততটা ওয়াকি বহাল নয়। কিন্তু আশার আলো এই অর্থে জাগায় যে, দ্বিতিয় বীশ্বযুদ্ধের পরে যে বিপর্যস্ত অর্থনীতি সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছিল তার হাত থেকে পরিত্রানের একমাত্র উপায় বা রাস্তা বাতলে দিয়েছিল এই আন্তকর্জাতিক অর্থভান্ডার সেই দিক থেকে বিচার করলে সংগঠনটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা :

বিশ্বের বভিন্ন দশের অর্থব্যবস্থা যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এই ধারনাটি সর্বপ্রথম ব্রেটন ওড্স প্রতিষ্ঠান গুলি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে। আসলে সমাজবিজ্ঞানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল আর্থ রাজনীতি। ইউরোপে পুঁজিবাদের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাটি গুরুত্ব অর্জন করতে শুরু করলেও ১৯৮০ এর দশকের শেষ বিশেষ করে ১৯৯০ র দশকের প্রথম লগ্নে বীশ্বায়নের যাত্রা এই আর্থ রাজনীতির সম্পর্ককে নতুন ভাবে ভাবতে সাহায্য করে। দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে বিজয়ী শক্তিসমূহ যুদ্ধ পরবর্তী বীশ্ব আর্থ রাজনীতি নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করে। এই উদ্দেশ্য বিজয়ী শক্তির ৭৩০ জন সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন ওডস্ এ মিলিত হয়ে ব্রেটন ওডস্ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ পরবর্তী

আন্তর্জাতিক অর্থ রাজনীতি তদারকি করা। এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অর্থ ভার্ন্ডার এবং পুনগঠন ও উন্নয়নের আন্তর্জাতিক ব্যাংক স্থাপন করা হয়। এই সংস্থা দুটি ১৯৪৫ সাল থেকে তাদের কাজ শুরু করে।

১৯৪৭ সালে গগট (General Agreement on Tariffs and Trade) স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য ১৯৪৮ সালের ১ লা জানূয়ারি যখন ২৩ টি দেশ গগট চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তখন থেকেই গগট কার্যকরী হয়। গগট নামক চুক্তিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক বানীজ্যের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বাধানিষেধ কমিয়ে ফেলল। এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ১৯৪৯ সাল থেকে আলোচনা শুরু হলে অবশেষে ১৯৯৩ সালে উরুগুয়ে তে গগটের সর্বশেষ আলাপ আলোচোনা সমাপ্তি হয়। ১৯৯৪ সালে গগট চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ১২৫ টি রাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর কচরে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় মরক্কোর মারাকাস এ। এই চুক্তির ফলে গড়ে ওঠে W.T.O বা World Trade Organization।

আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯৯৫ সালে ১লা জানুয়ারি বিশ্ববানীজ্য সংস্থা গঠিত হয়। সূচনালগ্নে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১২৩। যদিও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৬৪, ২০১৭ সালে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। দুটি নীতির উপর ভিত্তই করে এই সংস্থাটি গড়ে উঠেছে - (১) বৈষম্যহীনতা (২) স্বচ্ছতা। লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক বানিজ্য এবং শুল্ক হ্রাস ঘটিত বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহমত গড়ে তোলা। আন্তর্জাতিক বানীজ্য যাতে উন্নয়নের পথে ধাবিত হতে পারে সে দিকে নজর দেওয়া।

একিকথায় বলতে গেলে, বিশ্ববাণীজ্য সংস্থা হল এমন একটি সংগঠন যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল - আন্তর্জাতিক বণিজ্যের ওদারীকরণ সাধন করা। একই সাথে বউপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি রূপায়ন এবং বানীজ্যে লিপ্ত দেশগুলির বিরোধপূর্ণ স্বার্থের নিরসনই এই সংস্থার মুখ্য বিষয়। বিশ্ববাণিজ্যর সংস্থার সদর দপ্তর জেনিভাতে। মহা নির্দেশক এর নেতৃত্বে সংস্থা তার কার্যবিধি প্রনয়ন কররে থাকে। সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত -

(১) মহা নির্দেশক এর পাশাপাশি

(২) মন্ত্রনাসভা, যা মন্ত্রীস্তরের প্রতিনিধি নীয়ে গঠিত।

টিপ্পনী

(৩) সাধারণ পরিষদ, যা প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত।

(৪) বিবাদ নিষ্পত্তি সংস্থা, যা সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ নিরামনের জন্য গঠিত।

মুখ্য উদ্দেশ্য :

টিপ্পনী

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের বিরোধের আইন সম্মত সুষ্ঠু নিষ্পত্তি।

২. সমস্ত রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. অবাধ ও সুষ্ঠ বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা।

৪. গ্যাট পরবর্তীকালে উরুগুয়ে সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ রূপায়নের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সে গুলির সমাধান করা।

কার্যাবলী :

১. আমদানি ও রপ্তানি বানীজ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া যাতে কোন দেশের উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

২. বিশ্বের বহুদেশ তাদেদর কৃষকদের সুবিচার দিকে তাকিয়ে নানাপ্রকার অণুদান বা ভরতুকি দিয়ে থাকে যার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বানীজ্য যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তার জন্য এই অনুদান বা ভরতুকি প্রদানের ব্যবস্থার বিলোপের প্রস্তাব উঠলে এবং তুলে দেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার যাতে অসুবিধার মধ্যে না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখা বীশ্ববাণিজ্য সংস্থার কাজ।

৩. পরিষেবা বিতরনের ওপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ ছিল। সেগুলির বিষয়ে ঠিকমতো অগ্রসর হওয়া কতটা জরুরী তা বিবেচনা করবে সংস্থা।

৪. বিশ্ববানীজ্য সংস্থা বিশবব্যাংক ও আই. এম. এফ এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। ব্রেটন উড্স এ সেই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সর্বোপরি উন্নয়নশিল দেশগুলি যাতে পুঁজি প্রযুক্তি এবং উন্নয়নের অন্যান্য উপকরণ অতি সহজে সংগ্রহ করতে পারে সে দিকে এই সংস্থা দৃষ্টি দেবে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল

সংস্থাগুলি সহযোগী হিসেবে কাজ অবভাহত রাখলে ও প্রতিটি সংস্থার এক্তিয়ার স্িধর করে দেওয়া হয়েছে। যাতে একে অন্যের প্রবেশ না করে।

৫. কোনো কোনো দেশ নিজেদের একক স্বার্থের কথা ভেবে সংরক্ষণ নীতির আশ্রয় নেয় যার ফলে ঐদেশের আর্থিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা হলে ও বিশেষ করে যারা অনুন্নত এবং উন্নয়নশিল দেশ তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অথনীতি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ননয়। আবার অবাধ বাণিজ্যনিতিকে ঢালাও শংসাপত্র দেওবা যায় না। সুতরাং এই দুটি পরস্পরবিরোধী নীতির মধ্যে সমঝোতা আনতে হবে এবং সেই কাজটি করবে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থ।

৬. আন্তর্জাতিক বীশ্বরাজনীতিতে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে নানান বিষয়কে কেন্দ্র করে উত্তর গোলার্ধের দেশগুলির সঙ্গে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলির বোরোধ প্রায়শই আত্মপ্রকাশ করে। যার ফলে উন্নয়নের পথে আধায় সৃষ্টি হয়। বীশ্ববাণিজ্য সংস্থার কাজ হল এই বাধার বা উত্তেজনার পরিবেশ কাটিয়ে উন্নয়নের যাত্রাকে সমগ্র বিশ্বের স্বার্থে চালিত করা।

একথা ঠিক, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অথনীতির আলোচনায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গুরুত্ব সর্বজন বিদিত। কিন্তু সংস্থাটি সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাণিজ্য উদারিকরণ নীতি এবং এই নীতিসমূহ পচরবো্গকে কেন্দ্র করে এই সংস্থাটি বিরূপ মন্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে। এই কারণে অনেক এমনও মত পোষণ করে থাকে সংস্থাটিকে আরো অধিক পরিমাণষে গণতনতন্ত্র সম্মত করে তুলতে হবে। যাতে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন সবার পক্ষে উপযোগী হয়। সর্বোপরি সংস্থাটিকে আমরিকা রাইজেশন এর প্রভাব থেকে মুক্ত করা দরকার। কারণ পূর্বের সংস্থা গ্যাট আমেরিকার মদতে চলতো, বিশ্ববানিজ্য সংস্থাও যদি একই পথ অণুসরণ করে তাহলে আন্তর্জাতিক বিশ্বরাজনীতিতে অচলাবস্তার সৃষ্টি হতে বাধ্য তাহলে আন্তর্জাতিক বিশ্বরাজনীতিতে অচলাবস্তার সৃষ্টি হতে বাধ্য যার হত থেকে পরিত্রেনের রাস্তা খুঁজে বের করা দুরূহ বলে মনে হবে এবং আগামী দিনে এই সংস্থার ভূমিকা নিবে আরো বড়ো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রশ্নমালা :

১. জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনটি বিস্তারিত লেখ।

২. জাতিপুঞ্জের ও জাতিসংঘের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

৩. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে কি বলা আছে লেখ।

৪. জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ লেখ।

৫.জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে তোমার মতামত লেখ।

৬. সার্ক এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লেখ।

সার্কের কার্যপরিচলনা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

৮. OPEC সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা কর।

৯. WTO এর উদ্দেশ্য ও কাযর্যাবলী নীয়ে বিস্তরিত আলোচনা কর।

১০. আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের সাংগঠনিক কাঠামো লেখ।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. রাধারমন চক্রবর্তী, সুকল্পা চক্রবর্তী - সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা - ২০০৯

২. নির্মলকান্তি ঘোষ, পিতম ঘোষ, - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, শ্রীভূমি পাবলিশিং, কলকাতা - ২০০৪

৩. শক্তি মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংগঠন ও পররাষ্ট্র নীতি, ওয়ার্ল্ড প্রেস, কলকাতা - ২০০০

৪. অনীক চট্টোপাধ্যায় - ঠান্ডা যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০১২

৫. গৌতম কুমার বসু - সমসাময়িক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০১২

৬. প্রাণগোবিন্দ দাশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা) লিমিটেড, কলকাতা - ২০১১

৭. গৌরিপদ ভট্টাচার্য - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০০৪

৮. আরূপ সেন - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব ও তথ্য, নবোদয় পাবলিকেশনস, কলকাতা - ২০১২

৯. ড. অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় - আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সেন্ট্রাল পাবলিশিং, কলকাতা - ২০০৪

১০. অঞ্জনা ঘোষ - ঠান্ডাযুদ্ধ উত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংকট ও প্রবণতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা - ২০০৭

১১. বানীপদ সেন - সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়, বিন্যাস ও ব্যাখ্যা ; বিক্রম প্রকাশক ২০১০

টিপ্পনী

Notes

Notes

Notes